স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী
৪র্থ বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ ফেব্রুয়ারি - মার্চ ২০১৫

সম্পাদক
ডা. পুণ্যব্রত গুণ

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
ডা. জয়ন্ত দাস

সহযোগী সম্পাদক
ডা. পার্থপ্রতিম পাল ❑ ডা. সুমিত দাশ

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
ডা. অভিজিৎ পাল ❑ ডা. অমিতাভ চক্রবর্তী
ডা. অনুপ সাধু ❑ ডা. আশীষ কুমার কুন্ডু
ডা. চঞ্চলা সমাজদার ❑ ডা. দেবাশিস চক্রবর্তী
ডা. শর্মিষ্ঠা দাস ❑ ডা. শর্মিষ্ঠা রায়
ডা. তাপস মণ্ডল ❑ ডা. সোহম সরকার

বিন্যাস ও অঙ্গসজ্জা ❑ নিত্য দাস, মনোজ দে

প্রচ্ছদ ❑ উৎপল বসু

বিনিময় : ২০ টাকা

প্রকাশক
স্বাস্থ্যের বৃত্ত-এর তরফে ডা. জয়ন্ত কুমার দাস
ফ্ল্যাট : এফ-৩, ৫০/এ কলেজ রোড
হাওড়া ৭১১১০৩

মুখ্য পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা ৭০০ ০১৬
ফোন : ২২৫২-৭৮১৬ / ৩৭০৯ / ৯১৬৭

মুদ্রণ
এস এস প্রিন্ট, ৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০০০৯

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়— চিকিৎসা ব্যবস্থায় ন্যায়নীতি, চিকিৎসকের নৈতিকতা ৩

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ও নারীর অধিকার** ৫
চিকিৎসার কতগুলো মূল নীতি বা এথিক্স আছে। রোগীর আছে কিছু অধিকার, যা থেকে তাঁকে কোনো চিকিৎসকই বঞ্চিত করতে পারেন না। অথচ এ দেশে নারীদের চিকিৎসায় এইসব নীতির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। ফলে মাতৃমৃত্যু, চিকিৎসা-অবহেলাজনিত মৃত্যু এদেশে কমছে না— লিখছেন ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **সারভাইক্যাল ক্যানসার টিকাকরণ বৃত্তান্ত** ৯
নারীদেহে জরায়ুমুখ তথা সারভিক্স নামক প্রজনন-প্রত্যঙ্গে এইচপিভি ভাইরাস সংক্রমণ খুব সাধারণ ঘটনা, আর তার শতকরা ৯৯ ভাগ শরীর নিজেই সারিয়ে ফেলে। এইচপিভি ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধেও অপ্রমাণিত এক টিকাকে সারভাইক্যাল ক্যানসার আটকানোর মহাস্ত্র বলে চালানোর চেষ্টা করছে বড়ো ওষুধ কোম্পানি—লিখছেন অধ্যাপক শুভাশিস মুখোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **কোরপান-এর হত্যা : মূল্যবোধের চেনা ছক ভেঙে কিছু অচেনা প্রশ্ন** ১৫
একজন মানসিক ভারসাম্যহীন দরিদ্র মানুষ কোরপান শা-কে চোর সন্দেহে হোস্টেলে পিটিয়ে মেরেছে এক এলিট মেডিক্যাল কলেজের কিছু ডাক্তারি ছাত্র। হবু ডাক্তারদের এ-মতো আচরণের অনেকেই মর্মাহত— কী রকম চিকিৎসক হবে এই সব ছাত্র? কিন্তু এই সমাজে এই রকম ডাক্তার বানানোর পথ কি আমরাই প্রশস্ত করছি না? প্রশ্ন তুলেছেন ডা. রাতুল ব্যানার্জি।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : **কোরপান শা-র মৃত্যু ও তাঁর বাড়ির কিছু কথা** ১৭
কোরপান শা-কে ডাক্তারি ছাত্র পিটিয়ে মারার পর তাঁর পরিবারের জন্য সামান্য কিছু অর্থ তোলার উদ্যোগ নেওয়া ও সেই অর্থ কোরপানের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার অভিজ্ঞতা পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছেন ডা. গর্গ চ্যাটার্জি।

মূত্রে রক্ত বা হিমাচুরিয়া—কিছু জানার কথা ১৯
মূত্রের সঙ্গে রক্তপাতের অজস্র কারণ আছে, আর তার প্রাথমিক চিকিৎসা খানিকটা এক রকম হলেও কারণ অনুযায়ী চিকিৎসা আলাদা, আর ফলও এক রকম নয়— লিখছেন ডা. সৌম্যকান্তি বাগ।

নবজাতকের খাদ্য খাবার (পর্ব-৮)— কর্তব্যরত মায়েরা ও স্তন্যদুগ্ধের বিকল্প খাবার ২২
মা তাঁর শিশুকে স্তনদান করতে যদি না পারেন? যদি আটকা পড়েন কাজে বা অন্য কোনো অসুবিধায়? কী খাবে সেই শিশু? কেমন করেই বা পুরো পুষ্টি পাবে? উত্তর দিচ্ছেন ডা. স্বপন বিশ্বাস

এক গ্রামের ডাক্তারের গল্প (অষ্টম পর্ব) ২৬
প্রায় এক বছর পরে এই ধারাবাহিক রচনার অষ্টম ও শেষ কিস্তি। শহরের ছেলে এক ডাক্তার গ্রামে গিয়ে কেমন করে খুব জটিল ও কষ্টসাধ্য সব অপারেশন করলেন, কেমন করে গড়ে তুললেন তাঁর টিম, আর বিনিময়ে পেলেন মানুষের ভালোবাসা, সেই আখ্যানের শেষ পর্ব, আর তার থেকে পাওয়া শিক্ষার সারাৎসার তুলে ধরছেন ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত।

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে: ৩১

মূত্রপথের সংক্রমণ (ইউ টি আই) ৩২
ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে মূত্রপথের সংক্রমণ হয়, তবে মেয়েদের হয় বেশি। তার কারণ কিছুটা শারীরিক আর কিছুটা সামাজিক। এই রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা নিয়ে লিখছেন ডা. প্রতাপশঙ্কর দত্ত।

চিঠিপত্র : ৩৩

অস্বাভাবিক ঋতুচক্র এবং ঋতুস্রাব (ডিসফাংশনাল ইউটেরাইন ব্লীডিং) ৩৪
মেয়েদের অস্বাভাবিক ঋতুচক্র বা ঋতুস্রাবের অনেক কারণ থাকতে পারে। অনেক সময় তেমন কারণ পাওয়া যায় না, অথচ সমস্যাটা থাকেই— বিরক্তি ও উদ্বেগের একশেষ। সেই ডিসফাংশনাল ইউটেরাইন ব্লীডিং নিয়ে লিখছেন ডা. শিবেন্দ্রনাথ দাস।

ক্যুইজ : ৩৬

ডা. সরিতা তোসনিওয়ালের কাছে খোলা চিঠি... অথবা কত হাজার মরলে পরে বলবে তুমি শেষে.. ৩৭
মেয়ে ডাক্তারদের নিয়ে সমাজ এখনও দ্বিধাগ্রস্ত— সে ডাক্তারি করবে, কিন্তু ঘরকন্না সামলে। তাই সেদিনের কাদম্বিনী গাঙ্গুলি থেকে আজকের ডা. সরিতা তোসনিওয়াল— বিপরীতমুখী সামাজিক চাহিদার টানে তাঁদের পেশাগত বিকাশ, এমনকি জীবনও, ছিঁড়েখুঁড়ে যেতে থাকে— লিখছেন বিজয়া কর সোম।

রান্নাঘরে মারণ ফাঁদ ৪১
দূষণ বলতে আমাদের মনে কেবল কারখানার কালো ধোঁয়া আর রাস্তার ধুলোর কথা মনে পড়ে, অথচ আমাদের রান্নাঘরে সর্বদা যে দূষণ আমাদের মারছে, বিশেষ করে মেয়েদের আর বাচ্চাদের, সেটা আমরা দেখতেও পাই না। লিখছেন— মিলন দত্ত

সর্প দংশন (পর্ব ৩) ৪৪
সাপের কামড়ে মৃত্যু আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি। অথচ এদেশে অধিকাংশ সাপই বিষাক্ত নয়। বিষাক্ত সাপ কী করে চিনবেন? তাদের বিষের ধরনই বা কী? লিখছেন ডা. শেখ মাসুম।

সাফাইকর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে ৫১
শুধু সাফাইকর্মী কেন, যে সব মানুষ আমাদের সমাজের নীচের তলার বাসিন্দা, তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে সমাজের ভাবনা নেই, রাষ্ট্রের উদ্যোগ নেই, ডাক্তারের সহানুভূতি নেই। অথচ মানবিক চিকিৎসা তো লোক বেছে করা যায় না— লিখছেন ডা. অভিজিত পাল।

চেনা ওষুধ অচেনা কথা : ৫৩
'ব্যথার ওষুধ' আইবুপ্রোফেন নিয়ে লিখছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ।

আপনার খাদ্যাভ্যাসেই আপনার শারীরিক সমস্যার মুক্তি ৫৫
কী খাব, কতটুকু খাব, রোগ হলে কী ভাবে বদলাব আমাদের খাদ্যাভ্যাস, এই সব ব্যাপার নিয়ে আমাদের ধারণা বড়ো অস্বচ্ছ। আর সেই ভুল ধারণার ফাঁক দিয়েই রোগ হয়, রোগ বাড়ে—লিখছেন অনন্যা মণ্ডল

মেয়েদের সাদা স্রাব কি স্বাভাবিক? ৫৭
সাদা স্রাব নিয়ে ভোগেননি এমন মহিলা বিরল। এটা সব সময় কোনো অসুখের জন্য হয়, তা কিন্তু নয়। কখন অসুখ সন্দেহ করবেন আর চিকিৎসকের কাছে যাবেন, আর চিকিৎসকই বা কী করতে পারেন, তাই নিয়ে লিখছেন ডা. পুণ্যব্রত গুণ।

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম ❑ বুকমার্ক ❑ পিপলস্ বুক সোসাইটি ❑ বই-চিত্র ❑ মনীষা গ্রন্থালয়
নিউ হরাইজন বুক ট্রাস্ট ❑ অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ) ❑ এস. কে বুকস (উল্টোডাঙা)
শ্রমিক কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল) ❑ ডা. শুভজিত ভট্টাচার্য (উযুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)
কল্যাণদার স্টল (রাসবিহারী মোড়) ❑ মেডিকেল কলেজ এমার্জেন্সি গেটের বাইরের স্টল ❑ দুর্বার মহিলা সমন্বয়
কমিটি ❑ধানসিড়ি (রায়গঞ্জ) ❑ বইকল্প, ঢাকুরিয়া ❑ পুষ্প নিউজ এজেন্সি, মালদহ ফোন : ৯৯৩২৯৬৭৯৯১ ❑ জাতিস্মর
ভারতী, জলপাইগুড়ি : ফোন : ৯৯৩২৩৫৪৯৫৮ ❑ প্রয়াস মানভূম, লোকপুর, বাঁকুড়া : ৯৪৩৪২২৭৪৯৯ ❑ মাধব
পেপার স্টল, বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড : ৯৯৩২৪৫৫২৪৪ ❑ প্রদীপন গাঙ্গুলি, দার্জিলিং : ৮৫৩৫৮৯৫৩৯২
শিয়ালদহ ও হাওড়া মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনের বইয়ের স্টল

পাঠক ও লেখক পত্রিকার লেখার বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০৯২২১৯৪, ৯৩৩১০১২৫৩৭
পত্রিকা পাবার জন্য পাঠক ও এজেন্টরা যোগাযোগ করুন : ৯৮৩০৮৮৬৪৪১
ই-মেল : swasthyerbritte@gmail.com

'স্বাস্থ্যের বৃত্তে'-র গ্রাহক হোন।

সডাক গ্রাহক চাঁদা ৬ টি সংখ্যার জন্য ১৫০ টাকা।

'Swasthyer Britto' এর নামে চেক বা ড্রাফ্ট
(বাইরের চেকের জন্য ৩০ টাকা যোগ করুন) পাঠান এই ঠিকানায় —
এইচ এ ৪৪, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা ৭০০০৯৭।

অথবা NEFT -র মাধ্যমে পাঠান এই একাউন্টে
Swasthyer Britto,
A/c No. 0315101025024
Canara Bank, Princep Street Branch
IFSC Code : CNRB0000315

সম্পাদকীয়

চিকিৎসা ব্যবস্থায় ন্যায়নীতি, চিকিৎসকের নৈতিকতা

গত বছর নভেম্বর মাসে ছত্তীসগঢ়ের পাণ্ডারি বলে এক অখ্যাত গ্রাম হঠাৎ খবরের কাগজে শিরোনামে। সেখানে সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটা অব্যবহৃত নোংরা বেসরকারি হাসপাতালে 'শিবির' করে ৩ ঘণ্টার মধ্যে ৮৩টি 'লাইগেশন বা মহিলা-বন্ধ্যাত্বকরণ করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অন্তত ১৩ জন অপারেশনের পরেই মারা গেছেন, অসুস্থ আরও অনেকে। ডাক্তার আর কে গুপ্ত ওই ক্যাম্পে দু'মিনিটে একটা অপারেশন করেছিলেন, প্রথমে পুলিশ তাঁকেই ধরে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অবহেলার অভিযোগ আনা হয়। সরকারি নিয়ম, ওই রকম ক্যাম্পে ৩০টার বেশি অপারেশন করা যাবে না। কিন্তু ডা. গুপ্ত যে সে ডাক্তার নন, তাঁর সারা জীবনে তিনি ৫০,০০০ ওই অপারেশন করে রেকর্ড করেছেন বলে ছত্তীসগঢ়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী অমর আগরওয়াল তাঁকে গত প্রজাতন্ত্র দিবসে বিশেষ পুরস্কার দিয়েছেন।

ডা. গুপ্ত বলেছেন, ক্যাম্পে বেশি লোক এলেও তাঁদের সকলকে অপারেশন করা তাঁর কাজ। কথাটা হয়তো একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রশ্ন হল, দু' মিনিটে একটা 'লাইগেশন' অপারেশন ঠিকঠাক করা সম্ভব নয়, সেটা কি তিনি জানতেন না? না কি, যে সব মন্ত্রী-আমলা সরকারি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন, তাঁরা 'লাইগেশন' সংখ্যার বড়ো লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে হাততালি কুড়োবার বেলায় তৎপর, মানুষের জীবনের দাম তাঁদের কাছে বড্ড সস্তা? যাঁদের অপারেশন করা হচ্ছে, তাঁরা কি জানতেন অপারেশনে ভয়ানক কম সময় দেওয়া হচ্ছে, যন্ত্র পরিষ্কার না করেই ব্যবহার করা হচ্ছে, ওষুধ বলে যা দেওয়া হচ্ছে তার গুণমান দেখার কোনো ব্যবস্থাই নেই? মৃত ও অসুস্থ মহিলারা যে সেসব কিছুই জানতেন সেটা অবশ্য জোর গলায় বলে দেওয়া যায়, কারণ না জানানোই রীতি। আর জানবেনই বা কেন, তাঁরা তো সরকারি অফিসারদের ঠিক করে দেওয়া 'টার্গেট' সংখ্যার একটা টিক চিহ্ন মাত্র।

অথচ এক টুকরো কাগজে ওই সব নিরক্ষর মহিলা বা তাঁদের স্বামীদের টিপসই নেওয়া হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, তাঁরা অপারেশনের ভালোমন্দ, ঝুঁকি-বিপদ জেনে বুঝে অপারেশন করাতে সম্মত হলেন। অপারেশন ছাড়া জন্ম নিয়ন্ত্রণের অন্য যেসব পদ্ধতি আছে, সেগুলোর ভালোমন্দ নিয়ে কি তাঁদের কেউ কিছু বলে ছিলেন? না, বলেননি; হতদরিদ্র নারীদের কেবল বলা হয়েছিল বিনি পয়সায় অপারেশন, তার ওপর কয়েকশো থোক টাকা উপঢৌকন।

চিকিৎসা ব্যবস্থার ন্যায়ের ধারণা চারটি নীতিকে আশ্রয় করে থাকে— রোগীর স্বাতন্ত্রের নীতি, চিকিৎসার দ্বারা রোগীর ক্ষতিসাধন না করার নীতি, চিকিৎসার দ্বারা হিতসাধনের নীতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় ন্যায়পরায়ণতার নীতি। টুকরো কাগজে কয়েকটা টিপসই সমস্ত নীতিকে ব্যঙ্গ করে। আর যেসব চিকিৎসক তাঁদের পেশার মহত্বের কথা সদা-সর্বদা সমাজের অন্য সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন, যেসব নেতা আমলা মানুষের জন্য দিনরাত কেঁদে আকুল, তাঁরা এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিছু করছেন, এটা বিরল ঘটনা। বরং তাঁরা মানুষকে বহুজাতিক ওষুধ সংস্থার সস্তা গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার হতে দেন; আমাদের পার্লামেন্টারি কমিটি দেখিয়ে দিয়েছে 'গার্ডাসিল' নামধারী 'ক্যানসারের টিকা'-র ট্রায়াল দিতে গিয়ে কী ভাবে অজস্র নারীকে অকারণে বিপদের মুখে ফেলা হয়েছে।

চিকিৎসকদের পেশা দ্রুত আর পাঁচটা পেশার মতোই কেবল পয়সা রোজগারের একটা রাস্তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হওয়ারই কথা, চিকিৎসকরা তো আর সমাজের বাইরে থাকা কোনো জীব নন। হবু চিকিৎসকরা যাঁরা কোটি টাকার বিনিময়ে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ছেন, তাঁদের কেউ কেউ সেই টাকা উসুল করার পরিকল্পনায় ব্যস্ত। আর সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পড়ার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন যেসব মেধাবী ছাত্র, তাঁরাও নৈতিকতার খুব উঁচু মান দেখাচ্ছেন বললে সত্যের অপলাপ হবে। দারিদ্র্য প্রান্তিক মানুষ কোরপান শা চোর সন্দেহে কলকাতার এক সরকারি মেডিক্যাল কলেজে হোস্টেলে গণপ্রহারে খুন হয়ে গেলেন, আর হোস্টেল-ভর্তি 'মেধাবীর দল' কেউ কিছুই জানলেন না!

এখন কোরপানদের নিয়ে এলিট সমাজ কিছু ভাবতেই রাজি নয়। কিন্তু এই 'শিক্ষা' যখন সম্পূর্ণ হবে আর চিকিৎসার নামে চলবে লোক-ঠকানোর প্রতিযোগিতা, তখন এলিট সমাজই ডাক্তারদের গালি দেবে হৃদয়হীন বলে। নেতারা অবশ্য সব সময়েই এসবের ঊর্ধ্বে।

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র এই সংখ্যায় রইল এই সব বিষয়ে অনুভবী কিছু লেখা।

With Best Compliment from

SHINE PHARMACEUTICALS LTD.

P-77, KALINDI HOUSING ESTATE

KOLKATA - 700089

সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ও নারীর অধিকার

২০১৪ সালের ১০ ডিসেম্বর, মহাবোধি সোসাইটি হলে এই বক্তৃতা দেন **ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়।**

সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কথা মনে হলে একজন স্ত্রীরোগ চিকিৎসক হিসাবে প্রথমেই গভীর লজ্জাবোধ হয়। এখনকার দিনে কলকাতা শহরে 'রাপচারড অ্যাক্টোপিক প্রেগন্যান্সি'র কারণে কেউ যে মারা যেতে পারেন, তা অকল্পনীয় এবং লজ্জাজনক।

নারীর অধিকার প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একজন চিকিৎসক হিসাবে আমার দায়িত্ব বা কর্তব্যগুলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করে নিতে চাই। মেডিক্যাল এথিক্সের প্রথম পাঠ আমাদের মনে করিয়ে দেয় চারটে মূল নীতির কথা। প্রথমটা হল রোগীর স্বাতন্ত্র্যের নীতি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছে রোগীর চিকিৎসা গ্রহণ করা বা অস্বীকার করার ব্যাপারে স্বাধীন বিচার-বিবেচনাকে গুরুত্ব দেয়। সাবেকি অভিভাবকগিরির বদলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণের ব্যাপারে রোগীর বিচার ও পছন্দকে গুরুত্ব দেয় এই নীতি। দ্বিতীয় নীতি হল ক্ষতিসাধন থেকে বিরতির নীতি, যা কারও, বিশেষ করে রোগীর, কোনো রূপ ক্ষতিসাধন থেকে চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরত করে। তৃতীয় নীতি হল হিতসাধনের নীতি যা অপরকে, বিশেষ করে রোগীকে, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, রোগীর মঙ্গলবিধানের কথা বলে। চতুর্থটা হল ন্যায়পরায়ণতার নীতি, যা প্রত্যেক রোগীকে সমান চোখে দেখা, সকলকে সম্মান দেওয়া এবং বিশেষ করে দুষ্প্রাপ্য স্বাস্থ্য সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের পরামর্শ দেয়।

চিকিৎসকের দায়িত্ব বা কর্তব্যের প্রথমটাই হল রোগীর চিকিৎসাকে প্রাধান্য দেওয়া। তাঁর পেশাগত জ্ঞান বা দক্ষতা হবে আপ-টু-ডেট, এটাই অভিপ্রেত। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যেই কাজ করবেন। আমি একজন স্ত্রীরোগ চিকিৎসক হয়ে অ্যানাসথেটিস্টের কাজ করতে যাব না। চিকিৎসক প্রতি রোগীকে এক একজন ব্যক্তিমানুষ হিসাবে গণ্য করবেন এবং তাঁদের সম্ভ্রম রক্ষা করে চলবেন। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক মানুষের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার রয়েছে এবং চিকিৎসককে তা রক্ষা করতে হবে। মনে রাখতে হবে, চিকিৎসক রোগীর সম্পর্ক প্রভু-ভৃত্য বা অভিভাবক-সন্তানের মতো নয়। বরং চিকিৎসক এবং রোগী একই লক্ষ্যে ব্রতী হয়ে অংশীদার হয়ে কাজ করবেন। সর্বোপরি চিকিৎসকের দায়িত্ব হল বিশ্বাস ও আস্থা বজায় রাখা। তার জন্য তাঁকে নিঃস্বার্থভাবে রোগীর ভালো-মন্দের কথা ভাবতে হবে।

মহিলাদের অধিকার প্রসঙ্গ বলতে গেলে সর্বপ্রথম যে অধিকারের কথা মাথায় আসে তা হল বাঁচার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার এবং প্রজননগত স্বাতন্ত্র্য, সাম্য ও বৈষম্যহীনতার অধিকার। একটা দেশের মহিলাদের স্বাস্থ্য-সূচক দেখলে আন্দাজ করা যায় সেই দেশে মহিলাদের মৌলিক মানবাধিকার এবং মর্যাদাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, মহিলাদের অধিকার মানে শুধুই প্রজননগত অধিকার নয়, তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বও সমাজকে নিতে হবে। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের স্বাস্থ্য শুধুমাত্র তাঁদের জীবনেই প্রাসঙ্গিক নয়, পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আজকের আলোচনা আমরা সীমাবদ্ধ রাখব মহিলাদের প্রজনন সংক্রান্ত অধিকারে। যদিও রক্তহীনতা, সংক্রমণ ইত্যাদি ক্রনিক সমস্যাকে উপেক্ষা করতে চাই না, তবে একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমার কাছ থেকে আপনারা হয়তো তাঁদের গায়নোকোলজিক্যাল সমস্যা সংক্রান্ত অধিকারের কথাই শুনতে চাইবেন।

'ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস' (আইসিপিপিআর, অনুচ্ছেদ ৬) অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষের সহজাত অধিকার হল বাঁচার অধিকার। আইনের কর্তব্যই হল মানুষের এই বাঁচার অধিকার রক্ষা করা। ইচ্ছাপূর্বক কারও জীবন ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার আমাদের কারওরই নেই। পরিকাঠামোগত ত্রুটির জন্য কোনো অন্তঃসত্ত্বা বা নতুন মায়ের মৃত্যু (মেটারনাল মর্টালিটি) হলে এই অধিকার সবচেয়ে আগে লঙ্ঘিত হয়েছে বলে বলা যেতে পারে। 'মেটারনাল মর্টালিটি' বলতে মায়েদের গর্ভাবস্থা এবং গর্ভাবস্থা শেষ হওয়ার ৪২ দিনের মধ্যে যে সমস্ত মৃত্যুগুলো ঘটে, তাদের বোঝানো হয়। সন্দীপ্তার মৃত্যুও 'মেটারনাল মর্টালিটি'র মধ্যে পড়ে। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রাক্তন কমিশনার মেরি রবিনসন একবার বলেছিলেন, ''মাতৃমৃত্যুর মাত্রা মানবতার ওপর বিরাট আঘাত ও অপমান। একে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলেই গণ্য করতে হবে। মানুষের ওপরে অত্যাচার, নির্বিচারে বন্দি করে রাখা, নিখোঁজ করে দেওয়ার থেকে কোনো অংশে কম নয় এ ধরনের মৃত্যু।'' ২০১৩ সালে পৃথিবীতে প্রায় ২ লক্ষ ৮৯ হাজার 'মেটারনাল মর্টালিটি' হয়েছে, তার মধ্যে অন্তত পক্ষে ৫০ হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে আমাদের দেশে। সে ক্ষেত্রে আমরা তুলনীয় ঘানা, চাদ— আফ্রিকার এ সব দেশের সঙ্গে। আর জিডিপি-র ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের তুলনা করি চিন, আমেরিকার সঙ্গে! 'মেটারনাল মর্টালিটি'র পিছনে যেসব আর্থসামাজিক কারণ রয়েছে, সেগুলো হল দারিদ্র, নিরক্ষরতা, শিশু বিবাহ, জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়, স্বাস্থ্য পরিষেবার অপ্রতুল সুযোগ।

এছাড়া, তিনটে দেরির কারণে অধিকাংশ 'মেটারনাল মর্টালিটি' ঘটে। প্রথমটা হল, হাসপাতালে যেতে হবে, এই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করা। এটা আসতে পারে সচেতনতার অভাব থেকে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশার একটা সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, ২০-৫০ শতাংশ মহিলা বা তাঁদের পরিবার বুঝতেই পারেননি যে তাঁদের হাসপাতাল যাওয়া দরকার। দ্বিতীয় দেরিটা হল, সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রে ঠিক সময়ে পৌঁছোনো। হয় সেই কেন্দ্র আদৌ নেই বা তা এত দূরে যে মহিলাদের পক্ষে পৌঁছোনো সম্ভব হয়নি। তৃতীয় দেরিটা হল, পরিষেবা কেন্দ্রে পৌঁছোলেও পরিষেবা বা চিকিৎসা পেতে দেরি। রোগ নির্ণয়ে দেরি, চিকিৎসা প্রদানে দেরি বা চিকিৎসা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্তদের প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে এই দেরি হতে পারে।

ভারত সরকার ২০০০ সালে গৃহীত 'মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' অনুযায়ী, মাতৃমৃত্যুর হার ২০১৫ সালের মধ্যে লাখ প্রতি ১০৯-এ নামিয়ে

আনতে দায়বদ্ধ। তবে তা যাতে অর্জন করা **না** যায়, সেই চেষ্টা আমরা ভালো ভাবেই করে চলেছি। ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী, সংখ্যাটা হয়েছিল ১৭৮। আমাদের জাতীয় জনসংখ্যা কর্তৃপক্ষ যদিও ২০০০ সালেই আরও আরও কঠিন লক্ষ্যমাত্রা নিজেদের জন্য ধার্য করেছিলেন, তবে তাঁরা তা অর্জনে অনেকটাই সফল। এই সব লক্ষ্যমাত্রা পূরণে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ২০০৫ সালে নেওয়া জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (এনআরএইচএম) এবং জননী সুরক্ষা যোজনা। এনআরএইচএম অনুযায়ী, সব প্রেগন্যান্সি নথিভুক্তিকরণ আবশ্যিক, পারতপক্ষে প্রথম ১২ সপ্তাহের মধ্যে। গর্ভাবস্থায় মহিলাদের অন্ততপক্ষে চারবার চেকআপ করাতে হবে। মহিলারা বিনামূল্যে আয়রন ট্যাবলেট ও ফোলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট, টিটেনাস টক্সয়েড ইঞ্জেকশন পাবেন। সাধারণ রক্ত পরীক্ষাও বিনামূল্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। রোগীর পরিস্থিতি খারাপ হলে তাঁদের আর্থিক সুবিধা প্রদানকারী কোনো কেন্দ্রে পাঠানোর দায়িত্বও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রের।

বাঁচার অধিকারের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকারটা হল স্বাস্থ্যের অধিকার। এই অধিকারের চারটা দিক রয়েছে। Availability, accessability, acceptability, quality, অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিষেবা সুলভ হতে হবে, যাতে উপভোক্তা সেই পরিষেবার সুযোগ সহজে পান; উপভোক্তার কাছে সেই পরিষেবা গ্রহণযোগ্য হতে হবে, এবং সর্বোপরি সেই পরিষেবা হতে হবে আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং পরিষেবা প্রদানকারীরা হবেন সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

আমাদের দেশে পরিষেবার গুণমান জাহির করার কোনো প্রশ্ন তো আসেই না। বরং এখন খবরের কাগজ পড়লে চিকিৎসক হিসাবে মাথা হেঁট হয়ে আসে। যেমন ধরুন, ওড়িশার আঙ্গুল জেলায় নভেম্বরেই ঘটে যাওয়া ঘটনা। যেখানে ল্যাপারোস্কোপিক স্টেরিলাইজেশন অপারেশনে নির্ধারিত যন্ত্র ইনসাফ্লেটরের বদলে সাইকেলের চাকায় হাওয়া দেওয়ার পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক নাকি দাবি করেছেন, সাইকেল পাম্প ওই রাজ্যে এ ধরনের কাজে আকছার ব্যবহার করা হয়, দামি যন্ত্রপাতির পরিবর্তে। মহিলা, পুরুষ, ধনী, দরিদ্র, কেউই নিশ্চয় এই ধরনের পরিষেবা আশা করেন না। পরের উদাহরণটা পঞ্জাবের। এ মাসের শুরুর দিকে গুরুদাসপুর জেলায় অসরকারি সংস্থা আয়োজিত একটা বিনামূল্যে চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবিরে চোখের ছানি অপারেশনের পর অন্তত ৬০ জন মানুষ দৃষ্টি হারিয়েছেন। আবারও বলছি, চিকিৎসক হিসাবে, ভারতের নাগরিক হিসাবে এসব ঘটনায় লজ্জা হয়।

আইসিপিপিআর-এ (অনুচ্ছেদ ৯(১)) পরবর্তী যে অধিকারের কথা বলেছে, সেটা হল স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার। বাঁচার অধিকারের জন্য এই অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারীদের কাছে এটা মূল বুনিয়াদ হিসাবে কাজ করা উচিত। Right to reproductive self determination-র কথা মাথায় রেখে সরকারের দায়িত্ব এসে যায় মহিলাদের প্রজননগত অধিকারগুলো বাস্তবায়িত করার। তাঁরা কতগুলি সন্তান নিতে চান, কখন নিতে চান বা আদৌ নিতে চান কি না, এই সিদ্ধান্ত মহিলাদের একান্তই নিজেদের। সরকারের আরও দায়িত্ব রয়েছে, মহিলাদের জন্য নিরাপদ গর্ভপাতের ব্যবস্থা করার। বর্তমানে রোগীকে ভুল বুঝিয়ে তাঁর অমতে বন্ধ্যাত্বকরণের (coercive sterilisation) কোনো জায়গা নেই। আইসিপিপিআর (অনুচ্ছেদ ৭) মোতাবেক কোনো মানুষকে অমানবিক, আত্মমর্যাদাহানিকর কোনো চিকিৎসা বা কষ্টদায়ক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এটাকে বলা হয় right to freedom from cruel, inhuman, degrading treatment। মানবাধিকার কমিশনের মতে, এই অধিকার-বলে কোনো ব্যক্তি তাঁর আত্মমর্যাদা, শারীরিক ও মানসিক অক্ষুণ্ণতা (integrity) বজায় রাখতে পারেন।

এর পর আসি সমানাধিকার বা right to equality and nondiscrimination প্রসঙ্গে। প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন ভাবে জন্মেছেন এবং তাঁদের আত্মমর্যাদা এবং অধিকারসমূহ সমান। তত্ত্ব ও বাস্তবের ফারাক আছে তা আমরা প্রত্যেকেই জানি, তবু forewarned means forearmed. পূর্বাহ্নে সতর্কীকরণ করার অর্থ যথাসময়ে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলা। Right to informed consent বা জ্ঞাতসারে সম্মতি প্রদান একটা বহুল আলোচিত বিষয়। বিচারপতি বেঞ্জামিন কার্ডোজো ১৯১৪ সালে প্রথম বলেছিলেন এই ধারণার কথা (Schlendroof versus Society of New York Hospitals)। তবে তা প্রথম আইনি স্বীকৃতি প্রায় ১৯৬০ সালে (Natanson vs Kline) জ্ঞাতসারে সম্মতি প্রদান মানে শুধু একটা ইচ্ছাপত্রে সই করা নয়, এটাকে একটা পদ্ধতি হিসাবে দেখা উচিত যেখানে রোগীকে স্বাধীন ব্যক্তির সম্মান দেওয়া হয় এবং তাঁকে অনভিপ্রেত কোনো চিকিৎসা থেকে রক্ষা করা হয়। এর ফলে রোগীর স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে এবং রোগীর সক্রিয় অংশগ্রহণ পাওয়া যায়। এই ধরনের সম্মতি প্রদানের দুটো মূল ভিত্তি, doctor's disclosure and patients competence. —ডাক্তার সম্পূর্ণ তথ্য জানাবেন এবং রোগী সে তথ্য বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবেন। জরুরি অবস্থায় রোগী যদি নিজে অংশগ্রহণ করতে না পারেন, তা হলে তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি তাঁর হয়ে সম্মতি প্রদান করতে পারেন। এক এক সময় তাও সম্ভব না হতে পারে। সেক্ষেত্রে রোগীর হিতসাধনের নীতি (Principle of Beneficence) প্রযোজ্য, অর্থাৎ চিকিৎসক তাঁর রোগীর ভালোর জন্য যা করা দরকার, পরিস্থিতি অনুযায়ী তাই করতে পারেন।

জ্ঞাতসারে সম্মতি প্রদানের মতোই যে কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে তাঁর অনুমতি প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন। এটাকে Informed consent process-এর অঙ্গ হিসাবে দেখা যেতে পারে। চিকিৎসকের দায়িত্ব রোগীকে প্রস্তাবিত চিকিৎসার ফলাফল, গুণাগুণ এবং অন্য কোনো বিকল্প থাকলে তা বাতলানো। বিস্তারিত আলোচনা শেষে এমন একটা পরিস্থিতি যেন তৈরি হয় যাতে মনে হবে রোগী ও চিকিৎসক একসঙ্গে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন।

অনেকক্ষণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে মানবাধিকার তথা নারীর অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এবার দেখা যাক ভারতীয় সংবিধান আমাদের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছে। সংবিধানের মুখবন্ধেই সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে সমানাধিকারকে (Right to Equality) মৌলিক অধিকার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি মহিলাদের প্রতি যাতে সুবিচার হয়, সেজন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করার কথাও বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে আরও কয়েকটা ধারা আমাদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। যেমন অনুচ্ছেদ ২১ (জীবন এবং স্বাস্থ্যের অধিকার), অনুচ্ছেদ ১৪ (সমানাধিকার), অনুচ্ছেদ ১৫ (বৈষম্যবিহীন আচরণ পাওয়ার অধিকার)। এখন প্রশ্ন হল, আমাদের দেশের মেয়েরা কি এসব অধিকার ভোগ করেন? দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এ সব প্রশ্নের উত্তর উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

এবার আমরা কয়েকটি ঘটনা দেখে নিই। সুমিত্রা দেবী। উত্তরপ্রদেশের দলিত

পরিবারের ২৮ বছর বয়সী মেয়ে। ২০০৭ সালে ১৫ ডিসেম্বর তাঁর প্রসববেদনা ওঠে, প্রথমে পায়ে হেঁটে, পরে রিকশয় তিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছোন, সেখানে কোনো চিকিৎসক ছিলেন না। নার্স সুমিত্রার স্বামীকে একের পর এক ইঞ্জেকশন কিনে আনতে বলেন, পরে দেখা যায় মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে সুমিত্রাকে ১৪টা ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল কোনো কারণ ছাড়াই। পরে নার্স যখন দেখেন মেয়েটার শরীর ঠান্ডা হয়ে আসছে, পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন তিনি সুমিত্রাকে বেড থেকে নামিয়ে দিতে বলেন। সুমিত্রা মারা যায়। আমরা এতক্ষণ যে সব অধিকারের কথা বলছিলাম, সেই জীবনের অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, নিষ্ঠুর এবং অমানবিক ব্যবহার থেকে মুক্তি এবং বৈষম্যমুক্ত আচরণ না পাওয়ার অধিকার, সবই লঙ্ঘিত হয়েছে সুমিত্রার ক্ষেত্রে।

২০০৭ সালের ৩ এপ্রিল। মধ্যপ্রদেশের একটা ঘটনার কথা শোনা যাক। গীতা বাই, এক বানজারা মহিলা প্রসববেদনা নিয়ে হাসপাতালে যান। পরীক্ষায় দেখা যায়, তাঁর এইচআইভি রয়েছে। হাসপাতাল থেকে তাঁকে স্রেফ বার করে দেওয়া হয়। তিনি দু'বার হাসপাতালে ঢোকার চেষ্টা করেন কিন্তু আবার তাঁকে বার করে দেওয়া হয়। শেষে তিনি রাস্তায় সন্তানের জন্ম দেন। দু'দিন পরে সেপসিসে মারা যান তিনি। এক্ষেত্রেও জীবন বা স্বাস্থ্যের অধিকার বা বৈষম্যমুক্ত পরিষেবা পাওয়ার অধিকার, কোনো কিছুই রক্ষা করা হয়নি।

আমাদের বহু পদকজয়ী ক্রীড়াবিদ পিঙ্কি প্রামাণিকের কথা মনে আছে নিশ্চয়। বন্ধুকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। এমনকি মিডিয়ার ক্যামেরার সামনেও এক পুরুষ পুলিশকর্মী তাঁকে অসম্মানজনক ভাবে ধরে ছিল।

শুধু তাই নয়, তাঁর লিঙ্গ পরীক্ষার ভিডিও মোবাইলে মোবাইলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি পিঙ্কি সসম্মানে অভিযোগমুক্ত হয়েছেন, কিন্তু ওই পুলিশকর্মী বা যে স্বাস্থ্যকর্মীরা পিঙ্কিকে পরীক্ষার ভিডিও ফাঁস করেছিলেন, তাদের কী শাস্তি হল? কিছুই নয়।

এবার দু'একটা রোগ চিকিৎসার অবস্থা বা ক্লিনিক্যাল সিনারিও নিয়ে আলোচনা করা যাক। একজন স্ত্রীরোগ চিকিৎসককে হামেশাই এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। ধরে নেওয়া যাক, একজন আপাতসুস্থ সন্তানসম্ভবা ভদ্রমহিলা 'সিজারিয়ান ডেলিভারি' করাতে চান, অথচ স্বাভাবিক প্রসবের চেষ্টা না করার কোনো কারণ নেই। আমরা যদি এই প্রশ্নের বিচার মেডিক্যাল এথিক্সের মানদণ্ডে করি, তা হলে প্রথমে রোগীর স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান দেওয়া উচিত। তাঁর মতামত প্রকাশের অধিকার নিশ্চয় আছে, একজন চিকিৎসক যথাযোগ্যভাবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। তবে স্বাতন্ত্র্যের সম্মান দিতে গিয়ে রোগীর ক্ষতি না হয়ে যায়! এবার চিকিৎসকের দিকটা ভাবুন। কেউ ভাবতে পারেন, সিজারিয়ান একটা বড়ো অপারেশন এবং সেটা করলে স্বাভাবিক প্রসবের চেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে। অতএব তিনি রোগীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন। আবার কেউ ভাবতে পারেন, স্বাভাবিক প্রসবও তো ঝুঁকিহীন নয়। তা হলে একটা পরিকল্পিত সিজারিয়ানের দিকে গেলে আমি রোগীর বেশি হিতসাধন করব। এবার মনে করুন, এই মহিলা সরকারি হাসপাতালে ওই অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু সেখানে পরিকাঠামো সীমিত। সেখানে বিনা কারণে একজনকে সেই সুবিধা দিতে গেলে অন্য কাউকে হয়তো বঞ্চিত করতে হবে। যুক্তরাজ্যে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের প্রেক্ষিতে এই 'Justice' প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে। একটা সময়ে এনএইচএস এই ধরনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে, তবে ইদানীং তারা নীতি বদল করতে বাধ্য হয়েছে। তারা মেনে নিয়েছে একজন মহিলার 'সিজারিয়ান সেকশনে'র অধিকার রয়েছে।

এবার অন্য ধরনের পরিস্থিতি ভাবুন। একজন ১৫ বছর বয়সী মেয়ে যদি ডাক্তারের কাছে গিয়ে জন্মনিরোধক বড়ি চেয়ে বসে, তা হলে কী করা উচিত? এখানে কি তার স্বাতন্ত্র্য প্রাধান্য পাবে না ডাক্তার তাকে চাপ দেবে অভিভাবকদের পরামর্শ নেওয়ার জন্য? নাকি ডাক্তার নিজেই তাকে বলবেন যৌনসংসর্গে না যাওয়ার জন্য? আর বললেই কি ওই মেয়েটা শুনবে? এক্ষেত্রেও রোগীর হিতসাধনের নীতি প্রয়োগ করলে হয়তো দেখতে পাবেন মেয়েটাকে জন্মনিরোধক বড়ি দিলেই বোধহয় তার সবচেয়ে বেশি উপকার হবে। এক্ষেত্রে ব্রিটেনে ১৯৮২ সালের মিসেস ভিক্টোরিয়া গিলিক বনাম ওয়েস্ট নরফোক হেলথ অথরিটি মামলার উল্লেখ করি। মিসেস গিলিক প্রশ্ন তুলেছিলেন, তাঁকে না জানিয়ে চিকিৎসক কেন তাঁর ১৫ বছর বয়সী মেয়েকে জন্মনিরোধক পিল দিয়েছিলেন। কারণ, মেয়ে পিল খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো পরিণত নয়। শেষ অবধি আদালতের রায়ে বলা হয়েছিল, ১৬ বছরের নীচে কোনো মেয়ে মানসিকভাবে কতটা পরিণত, পরিস্থিতি সে কতটা বুঝতে পারছে এবং পিল খাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি তার কতটা রয়েছে, চিকিৎসক তা বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেই পরিণতমনস্কতা মেয়েটার থাকলে তা সজ্ঞানে সম্মতিদান বলেই গণ্য করা হবে।

এবার ভাবা যাক, একটা ১৫ বছরের কিশোরী যদি ডাক্তারের কাছে গিয়ে গর্ভপাতের অনুরোধ জানায়, ডাক্তার কী করবেন? কিশোরীটি এ-ও যদি জানায় যে অভিভাবকেরা কিছুই জানেন না এবং সে জানাতেও চায় না? ডাক্তার কি মেয়েটাকে অভিভাবকদের ঘটনাটা জানাতে বলবেন না গর্ভপাত করবেন? এক্ষেত্রেও কিশোরীর স্বাতন্ত্র্য, অধিকার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা, গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার এবং সর্বোপরি মেয়েটার কীসে ভালো হবে, তা মাথায় রেখে ডাক্তারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

ভারতে গর্ভপাতের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৭১ সালে। আমেরিকায় তা হয়েছে তার দু'বছর পরে। গর্ভাবস্থায় ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত গর্ভপাত করানোর অধিকার মেয়েদের আছে। মূলক দুটো কারণে এই গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া হয়। একটা হল মায়ের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে। অন্যটা হল বাচ্চাটার যদি শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার সম্ভাবনা থাকে। তবে ২০ সপ্তাহ

পেরিয়ে গেলে এই অধিকার আর প্রয়োগ করা যায় না। কয়েক বছর আগে নিকিতা নামে এক মহিলা ২০ সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পর গর্ভপাতের অনুমতি চেয়ে বম্বে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। কারণ, ডাক্তাররা তাঁকে জানিয়েছিলেন, যে জন্ম নেবে, সে কিছু ত্রুটি নিয়ে জন্মাবে এবং বাঁচবে না। আদালত তাঁকে গর্ভপাতের অনুমতি দেয়নি।

সবশেষে সেই লজ্জাজনক ঘটনা। নভেম্বরে ছত্তীসগড়ে একটা বন্ধ্যাত্বকরণ শিবিরে ১৩ জন নিরপরাধ মহিলাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। প্রথমে সেই চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি রেকর্ড সময়ে রেকর্ড সংখ্যক বন্ধ্যাত্বকরণ অস্ত্রোপ্রচার করার জন্য সরকারি পুরস্কার পেয়েছিলেন আগে। তারপর জানা গেল, শিবিরে ব্যবহৃত ওষুধে ইঁদুরের বিষ মিশে গিয়েছিল। ফলে সেই ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার মালিককে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু এ ধরনের শিবির আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থাকেই কয়েকটা প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেয়। জানতে ইচ্ছে করে, কতজন স্বেচ্ছায় ওই শিবিরে গিয়েছিলেন? কেউ কি তাঁদের জ্ঞাতসারে সম্মতি প্রদানের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন? জন্মনিয়ন্ত্রণের অনেক বিকল্প পদ্ধতি আমাদের হাতে এসে গিয়েছে। কেউ কি তাঁদের সঙ্গে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন? যে দরিদ্র, অনগ্রসর শ্রেণি থেকে তাঁরা এসেছেন, তাঁদের পক্ষে কি বন্ধ্যাত্বকরণের উৎসাহভাতা বাবদ দেওয়া কয়েকশো টাকা প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল? তাই যদি হয়, তবে টাকার বিনিময়ে কি বৈধ সম্মতি নেওয়া যায়? শুনেছি, এক একটা জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিককে ওপরওয়ালারা 'টার্গেট' দেন যে গোটা বছরে ক-টা বন্ধ্যাত্বকরণ করতে হবে! মহিলাদের পণ্য হিসাবে দেখানোর এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কী হতে পারে? পাশের ছবিটা দেখুন।

তাহলেই বুঝবেন মানুষের অধিকার, গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার-সহ প্রতিটা মৌলিক অধিকার কী ভাবে ছত্তীসগঢ়ে লঙ্ঘিত হয়েছে। ছি!

সবশেষে এক নজরে দেখে নিই, মহিলাদের স্ত্রীরোগ চিকিৎসা সংক্রান্ত অধিকারগুলো।

জীবন স্বাস্থ্য, সাম্য এবং বৈষম্যহীন আচরণ পাওয়ার অধিকার।

সব তথ্য জেনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার।

নিয়মিত সুলভ, গুণমানসম্পন্ন এবং বিশ্বাসযোগ্য চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার অধিকার।

প্রত্যেক দম্পতির অবস্থা বিচার করে উপযুক্ত জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বেছে নেওয়ার বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়ার অধিকার।

লিঙ্গভিত্তিক হিংসামুক্ত যৌন এবং প্রজনন সংক্রান্ত নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার।

পরিশেষে এই অত্যন্ত সাধারণ বক্তব্য ছত্তীসগঢ়ের ওই নিরীহ মহিলাদের উৎসর্গ করলাম।

লেখক পরিচিতি : ডা. কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, এমবিবিএস, এফআরসিওজি, স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন

সারভাইক্যাল ক্যানসার টিকাকরণ বৃত্তান্ত

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

‘যৌন-সক্ষম ১০ জন নারীর মধ্যে ৮ জন নারী সম্ভবত তাদের জীবনকালে কখনও না কখনও হিউম্যান পাপিলোমা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হবে। মানব দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য এই আক্রান্ত নারীদের দেহে কোনো উপসর্গ দেখা যায় না এবং আক্রান্তদের মধ্যে ৯৮ শতাংশ নারীর আপনা থেকেই রোগ নিরাময় হয়ে যাবে। কিন্তু অল্প যে সমস্ত ক্ষেত্রে তা আপনা থেকেই নিরাময় হবে না এবং সেই সংক্রমণের যদি চিকিৎসা না হয়, তবে হয়তো এই সমস্ত আক্রান্ত নারীদের একাংশের শরীরে ক্যানসার-পূর্ব কোষের জন্ম হতে পারে এবং এই কোষগুলো থেকে কোষ পর্যন্ত ক্যানসার হওয়ার *সম্ভাবনা* উড়িয়ে দেওয়া যায় না।’

—ডা. ডিয়ান হার্পার

পাপিলোমার বিরুদ্ধে টিকা আবিষ্কারের গবেষণার সবচেয়ে সফল চিকিৎসক। ৪র্থ আন্তর্জাতিক টিকাকরণ সম্মিলন, ভার্জিনিয়া, অক্টোবর ২, ২০০৯-এ প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ।

ক্যানসার রোগের নাম শুনলে গড়পড়তা মানুষের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত প্রবাহিত হয়। বেশির ভাগ চিকিৎসকই জানেন যে এক্ষেত্রে রোগ, রোগের প্রাদুর্ভাব, রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞান এখনও আহরণ করা যায়নি। তাই রোগ প্রতিরোধের একটা সম্ভাব্য নতুন ওষুধ বা রোগ প্রতিরোধের পদ্ধতি ব্যবহার করা নিয়ে চিকিৎসকরা ধন্দে পড়ে যান। একটা রোগের প্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে কিছুটা দূর ভবিষ্যতে—কিন্তু তার জন্য আজকেই একদল সুস্থ, সবল, নিরোগ বালক বা বালিকার ওপর ওষুধ বা অন্য কোনো প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হবে, এই বিষয়টা সেই সমস্ত ক্ষেত্রে খানিকটা বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। টিকাকরণ পদ্ধতি এবং টিকার রাসায়নিক উপাদান এমনই একটা ধন্দে ফেলে দেওয়ার মতো বিষয়।

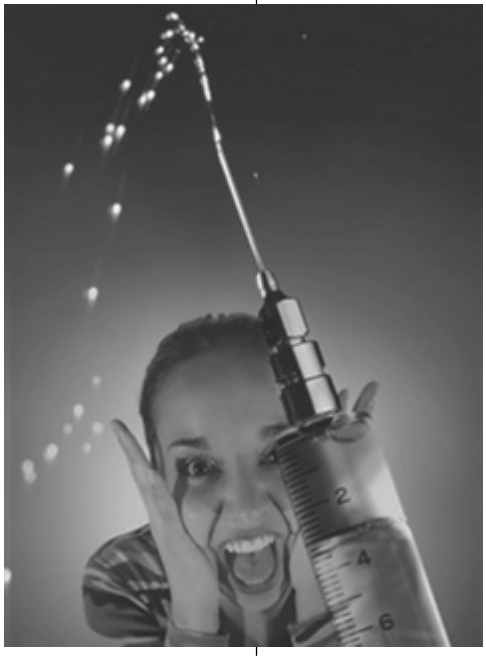

২০০৮-এ শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী জুর হাউসেন দেখান যে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস বা এইচপিভি -র কয়েকটা রকমফেরের সংক্রমণকে সারভাইভ্যাল ক্যানসারের কারণ হিসেবে বর্ণনা করা যায়। তাঁর এই আবিষ্কার থেকে মানবদেহের এইচপিভির স্বাভাবিক সংক্রমণ সংক্রান্ত বহু তথ্য জানা যায়। বোঝার চেষ্টা শুরু হয় কী ভাবে এই অণুজীবের সংক্রমণ ক্যানসারে পর্যবসিত হয়। *ক্যানসার রোধের জন্য নয়, কেমন ভাবে এই অণুজীবের সংক্রমণ রোধ করা যায়,* সে বিষয়ে গবেষণা এক আপাত কার্যকর এক টিকা উদ্ভাবনের দিশা দেয়। জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন একটা টিকা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলে।

এমন একটা টিকার সম্ভাবনার কথা জানাজানি হয়ে গেলে ওষুধ কোম্পানিগুলোর মধ্যে টিকা বাজারজাত করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকরা যে কথাটা কখনও বলেননি, সেই কথাটা সুকৌশলে তাঁদের মুখে বসিয়ে দিয়ে কোম্পানিগুলোর মধ্যে বিজ্ঞাপন-যুদ্ধ শুরু হয়। যুক্তিটা ছিল খানিকটা এই রকম : মানবদেহে এইচপিভি সংক্রমণ যদি টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায়, তবে এই সংক্রমণ জনিত ক্যানসারও আর ঘটবে না—অতএব এইচপিভি সংক্রমণ নিরোধক টিকা = ক্যানসারের বিরুদ্ধে টিকা!

সমস্যার শুরু

সমস্যার শুরু এখান থেকেই। আমাদের জ্ঞানত এখন পর্যন্ত ১০০ রকমফেরের এইচপিভি অণুজীব বিদ্যমান, তাদের মধ্যে প্রায় ১৫টি রকমের সংক্রমণ বিভিন্ন তীব্রতার সারভাইক্যাল ক্যানসারের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। নারী দেহের একটা বিশেষ স্থান হল সার্ভিকস্। মূলত যৌন সক্ষমতার বা রজঃস্বলা হওয়ার দ্বারপ্রান্তে থাকার সময় থেকে যৌন-সক্ষম জীবনের যে কোনো দিন নারীরা সারভিক্সে এই এইচপিভি দ্বারা আক্রন্ত হতে পারে। এই আক্রান্তদের মধ্যে কোনো কোনো নারী সারভাইক্যাল ক্যানসারেও আক্রান্ত হতে পারে। এই সংক্রমণের মূল মাধ্যম হল যৌনক্রিয়ার সময়ে ত্বকের সঙ্গে ত্বকের স্পর্শ। সারভাইক্যাল ক্যানসারের কারণ হিসেবে এইচপিভির ভূমিকা আছে, এটা জানা থাকলেও এইচপিভি সংক্রমণ ও ক্যানসারের মধ্যেকার কার্যকারণ সম্পর্ক এখনও অনেকটাই অজানা। বর্তমান গবেষণায় জানা যাচ্ছে যে ক্যানসারের সঙ্গে যুক্ত এইচপিভির প্রায় ১৫টি অণুজীব রকমফেরের মধ্যে দুটোর (এইচপিভি-১৬ এবং এইচপিভি-১৮) উপস্থিতি বেশিরভাগ প্যাপিলোমা ঘটিত ক্যানসারের সঙ্গে জড়িত।

অল্প বয়সে ঘটা একটা সাধারণ সংক্রমণ থেকে ২০ থেকে ৪০ বছর পর কী ভাবে তা ক্যানসারে পর্যবসিত হতে পারে তার শারীরবৃত্তীয় এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত প্রক্রিয়া এখনও অজানা। এই অণুজীব থেকে সংক্রমণ সাধারণভাবে খুব মারাত্মক নয়, কেননা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই সংক্রমণকে মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অকার্যকর এবং নিষ্ক্রিয় করে দেয়, এবং ভবিষ্যতে পুনরায় সংক্রমণের সম্ভাবনাও একদম কমে যায়।

যে অল্প কয়েকটা ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ মানবদেহে থেকে যায় সেই সব ক্ষেত্রে আক্রান্ত নারীদের একটা

অংশের (ঠিক কত শতাংশ তা এখনও সঠিক জানা নেই) দেহে ক্যানসার পূর্ব সারভাইক্যাল ক্ষত দেখা দিতে পারে। যতজন নারীর দেহে এমন ক্ষত দেখা দেবে তাদের একাংশ (ঠিক কত তা আজও জানা নেই) শেষ পর্যন্ত সারভাইক্যাল ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারে। এই সমস্ত কারণে এইচপিভি ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর টিকাকে সারভাইক্যাল ক্যানসারের টিকা বলা কার্যত অসম্ভব।

টিকার বৃত্তান্ত

বর্তমানে বাজারে ৪টি এইচপিভি রকমফেরের বিরুদ্ধে কার্যকর বলে প্রচারিত দুটো টিকা পাওয়া যায়। একটা মার্কিন ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থা, 'মার্ক' (MERCK) কোম্পানির 'গার্ডাসিল' এবং অন্যটা গ্ল্যাক্সো-স্মিথ-ক্লাইন কোম্পানির 'সার্ভারিক্স'। আমরা আমাদের আলোচনা মার্ক সংস্থার বহু বিজ্ঞাপিত গার্ডাসিল-এর ওপরই সীমাবদ্ধ রাখব, যদিও আলোচনার বৈজ্ঞানিক অংশটা 'সার্ভারিক্স' সম্পর্কেও কমবেশি প্রযোজ্য।

২০০৬ সালের জুন মাসে ভেষজ এবং টিকা সংক্রান্ত মার্কিন ছাড়পত্রদানকারী সংস্থা, ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সংক্ষেপে এফডিএ, এই গার্ডাসিলকে ছাড়পত্র দেওয়ার সময় স্পষ্ট বলে দেয়, ''এই টিকাটি ৯-২৬ বছরের নারীদের ওপর প্রয়োগের বিষয়ে ছ'মাসের সমীক্ষা চালিয়ে, এফডিএ-র দ্রুত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ছাড়পত্র দেওয়া হল। এমন রাস্তা নেওয়া হল এই কথা ভেবে যে এই টিকার স্বাস্থ্য বিষয়ে বিরাট সম্ভাবনা থাকতে পারে।'' এই টিকাটার দুটো ক্যানসারের সঙ্গে যুক্ত অণুজীব এবং যৌনাঙ্গে অন্যান্য ধরনের দুটো সংক্রমণের (প্রধানত আঁচিল জাতীয় বস্তু গজানো) বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার কথা।

এই টিকাকরণের সময়কাল ছ'মাস। প্রথম দফা টিকা নেওয়ার পর দু'মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফা এবং প্রথম টিকাকরণের ছ'মাসের মধ্যে তৃতীয় দফা সম্পন্ন করতে হবে। মার্কিন দেশে প্রতি দফা ইনজেকশনের মূল্য ১২০ ডলার, পুরো তিন দফার খরচ ৩৬০ মার্কিন ডলার। যে কথাটা স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া দরকার তা হল এই টিকা সারভাইক্যাল ক্যানসারের বিরুদ্ধে নয়, এই রোগ প্রতিরোধ বা প্রতিহত করা বা নির্মূলীকরণে এই টিকাটার প্রায় কোনো ভূমিকাই নেই। এই টিকা নারীদের সারভাইক্যাল ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমাচ্ছে, এমন প্রমাণ নেই। সারভাইক্যাল ক্যানসারের 'মহামারী' হওয়ার যে আশঙ্কার

"This new mandatory STD vaccine shouldn't hurt a bit."

কথা টিকা প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলো সজোরে প্রচার করছে তা অনেকাংশেই অমূলক, কেননা এই অণুজীবের সংক্রমণের প্রায় ৯০ শতাংশই মানবদেহের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতিহত করে দেয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্তমান গবেষণামতে সারভাইক্যাল ক্ষত থেকে সারভাইক্যাল ক্যানসার হওয়ার প্রক্রিয়াটা খুবই সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া—২০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। অন্যান্য ক্যানসারের মতো এ ক্ষেত্রেও যত আগে রোগটা ধরা পড়বে, তত তাকে প্রতিহত করার অথবা সেরে ওঠার সম্ভাবনা বাড়বে। আমাদের দেশ-সহ বিভিন্ন দেশে নারীদের নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব, ক্ষেত্র বিশেষে করা হয়েও থাকে। যদি আগে ধরা পড়ে, তবে সেই রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব। আক্রান্ত নারীদের অনেকেরই সেই চিকিৎসায় নিরাময়ও ঘটে।

মার্ক সংস্থার গার্ডাসিল সংক্রান্ত কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে এই টিকাকরণের ফলে নারীদেহে অণুজীবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বড়ো জোর সাড়ে তিন বছর স্থায়ী হয়। এর অর্থ, একজন বালিকাকে যদি তার ১২ বছর বয়সে টিকা দেওয়া হয়, তা হলে যখন সে ১৫-১৬ বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন তার এই এইচপিভির চারটি রকমফেরের সংক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে না। পরবর্তী ক্ষেত্রে, যাকে 'বুস্টার ডোজ' বলা হয়, সে সম্পর্কে এখনও কিছুই নিশ্চিত ভাবে জানা নেই।

এই টিকার গোড়াতেই গলদ—অণুজীব দ্বারা সংক্রমণ কমানো এবং তার ফলে সারভাইক্যাল ক্যানসার না ঘটা, এই সুস্পষ্ট কার্যকারণ সম্পর্কটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ছ'মাসের জন্য পর্যবেক্ষণ করে ২০ বছর পর কী কী ঘটবে, তার সম্পর্কে যে কোনো মন্তব্যই অনুমান ভিত্তিক। পরীক্ষায় যা প্রমাণিত হয়েছে তা হল এই টিকাকরণের ফলে ওই চারটি এইচপিভি অণুজীবের রকমফেরের বিরুদ্ধে স্বল্প মেয়াদে নারীদেহে সংক্রমণ প্রতিরোধ-কারী রাসায়নিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এই টিকাকরণের আগেই যদি কেউ এইচপিভি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে এই টিকা তার জন্য কাজ করবে না।

গার্ডাসিলের কিস্‌সা

এমন আজব বস্তুকে সারা পৃথিবীর নানান দেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টিকা বলে ঘোষণা করে টিকাটার বড়ো মাপের প্রয়োগ কেন শুরু করল, তার বৃত্তান্তটা স্বাস্থ্য বিষয়ক মহা কেলেঙ্কারির অনেকগুলোর মধ্যে মাত্র একটা। কী ভাবে মার্ক এবং গ্ল্যাক্সো-স্মিথ-ক্লাইন সংস্থা এমন একটা 'অসাধ্য সাধন' করতে পারল এবং এই দুঃসাহসী পদক্ষেপের পরিণাম শেষ বিচারে কী হয়েছে, তার একটা বর্ণনা রাখা জরুরি।

ছাড়পত্রের গল্প—মার্কিন কেলেঙ্কারি

একটা টিকার মানব দেহের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিমাপ, তার কার্যকারিতা এবং বিরূপ প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক হতে গেলে কমপক্ষে ৩ থেকে ৫ বছর বহু মানুষের ওপর দফায় দফায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সমীক্ষাও চালাতে হয়। এই বিশেষ টিকাটার জন্য এই আপাত দীর্ঘকালীন প্রেক্ষিতটি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা রোগটার প্রকাশ হয়তো ঘটবে আগামী দু'দশক পর এবং তার জন্য আমরা টিকাটা এখনই প্রয়োগ করছি। আজ পর্যন্ত কোনো দীর্ঘকালীন সমীক্ষা এই টিকার জন্য করা হয়নি। যে পরীক্ষার ওপর

ভিত্তি করে এফডিএ এই টিকাকে বাজারে চালু করার জন্য দ্রুত ছাড়পত্র দিয়েছে, সেটার সময়সীমা ছ'মাস। অল্প মানুষের ওপর, হাতের কাছে যাঁদের পাওয়া গেছে, তাঁদের নিয়েই এই পরীক্ষা করা হয়েছে। এমন এক অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে ছাড়পত্র পেতে গেলে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হবে সন্দেহ নেই। অতএব অসংখ্য দুর্নীতির একটা সেরা দুর্নীতির কথা শোনা যাক।

মুরুব্বিদের যথোচিত পরিমাণ উৎকোচ ও সুবিধা দিলে, তাদের স্বজন-পোষণে মদত দিলে, কর্তব্যপরায়ণ কর্মীদের হুমকি দিয়ে কর্তব্য পালনে নিরস্ত করতে পারলে যে কোনো দেশে যে কোনো কাজই হাসিল করা সম্ভব। আমেরিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আমেরিকায় আদায় করা ছাড়পত্র অন্যান্য দেশে খুবই মান্যতা পায়। তাই মার্ক সংস্থা প্রথমে তার 'এরিয়া অফ অপারেশন' হিসেবে আমেরিকাকেই বেছে নেয়।

এত দামি একটা বস্তুকে বাজারে বড়ো আকারে বিক্রি করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন বস্তুটা বেশি পরিমাণে খরিদ করবে এমন একটা খরিদ্দার জোগাড় করা। আর কে না জানে যে টিকার জন্য সরকারের চেয়ে বড়ো খরিদ্দার মেলা ভার! এই টিকার 'টার্গেট গ্রুপ' ৮ থেকে ১৫ বছরের বালিকারা। এই লক্ষ্যে মার্ক একটা দীর্ঘমেয়াদি রণকৌশল গ্রহণ করে। প্রথমে মার্ক সংস্থা আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের মাধ্যমিক স্তরের যাবতীয় বালিকা বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে এই টিকাকরণ বাধ্যতামূলক করার আইন প্রণয়নের জন্য সাংসদ এবং আইনপ্রণেতাদের নানান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া শুরু করে। এই উদ্দেশ্যে মার্ক 'উইমেন ইন গভর্নমেন্ট নামে একটা 'স্বেচ্ছাসেবী' সংস্থা খোলে। সংস্থা নামেই স্বেচ্ছাসেবী, আসলে তার সমস্ত আর্থিক দায়ভার বহন করে মার্ক। এই তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ২০০৭ সালে মার্কের প্রত্যক্ষ আর্থিক সাহায্যে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০ জন সেনেটরকে ফ্লরিডার সমুদ্র সৈকতে উড়িয়ে আনে এবং গার্ডাসিল টিকা কেন অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু সেই মর্মে একটা মহার্ঘ আলোচনার ব্যবস্থা করে। প্রচুর উপহার এবং অন্যান্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সুবিধার প্রতিশ্রুতিতে এই ৬০ জন সেনেটর একযোগে আমেরিকার ২০টা রাজ্যে মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক স্কুলে পাঠরতা বালিকাদের জন্য এই গার্ডাসিল টিকাকরণ বাধ্যতামূলক করা হল বলে আইন তৈরি করে।

এতেও ক্ষান্ত না হয়ে মার্ক দ্বিতীয় দফা প্রচারে নেমে আরও একদল সেনেটরের সাহায্যে আমেরিকা কয়েকটা রাজ্যে আর একটা আইন পাশ করায় যে সেই সমস্ত রাজ্যে এই গার্ডাসিল টিকাকরণের সার্টিফিকেট না থাকলে মেয়েরা পরবর্তী স্তরের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না।

এই বৃহৎ আকারের টিকাকরণ চালানোর জন্য, বলাই বাহুল্য, মার্কিন সরকার মার্কের কাছ থেকে বস্তা বস্তা গার্ডাসিল টিকা খরিদ করে। এখানেই শেষ নয়। মার্ক সংস্থা আমেরিকার অভিবাসন মন্ত্রকের মাধ্যমে নিয়ম করে দেয় যে আমেরিকার অভিবাসনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত ১১ বছর থেকে ২৬ বছর বয়সের নারীরা আসছেন, তাঁদের অতঃপর বাধ্যতামূলক ভাবে গার্ডাসিলের তিনটে দফা টিকাকরণের সার্টিফিকেট দিতে হবে— কিন্তু তাঁদের জন্য গার্ডাসিলের দাম পড়বে ৩৭৫ মার্কিন ডলার।

মার্কের আয়কর সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে ২০০৭-২০০৮ আর্থিক বছরে মার্কের বিক্রি বেড়েছে ৫৪ শতাংশ—যার সিংহভাগ (৭৫ শতাংশ) এসেছে এই গার্ডাসিল বিক্রি ও বিপনন থেকে।

গার্ডাসিলের প্রতিক্রিয়া— আমেরিকা

অবৈজ্ঞানিক ধারণা এবং মুনাফা যে টিকাটির ভিত্তি, সেটা যে তার নির্ধারিত ভূমিকার বদলে ভয়ানক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে, এটা আর বেশি কথা কি! এই টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মারাত্মক— ভার্জিনিয়া রাজ্য এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই মাধ্যমিক স্তরের বালিকাদের ওপর এই টিকা প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করেনি। বিভিন্ন নিরপেক্ষ গবেষণার সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুসারে এপ্রিল ২০১১ পর্যন্ত আমেরিকা এই টিকার জন্য ২০ হাজার মানুষের মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়েছে। ৯৫ জন নারী মৃত্যু বরণ করেছেন, যে সংখ্যাটা ২০১৪-র জুন মাসে দ্বিগুণ ছাড়িয়েছে। টিকা নেওয়া বালিকাদের মধ্যে পরবর্তীকালে গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব বাড়তির দিকে। জনস্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এই টিকার একটা বিশেষ বিপদমূলক দিক রয়েছে, যা নিয়ে জীবরসায়ন বিজ্ঞানীরা চিন্তিত। জৈব প্রযুক্তিজাত এই টিকায় মানুষের ডিএনএ এবং ক্যানসার সৃষ্টিতে সক্ষম প্যাপিলোমা ভাইরাল ডিএনএ মিলে মিশে থাকায় সেটা মানুষের দেহে প্রবেশ করার পর মনুষ্য-কোষের ওপর তার প্রতিক্রিয়া অজানা। এটা ভবিষ্যতে বিপদের কারণ হতে পারে।

গার্ডাসিল— সারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা

স্পেন, জুলাই ২০১৪ : গার্ডাসিল ইঞ্জেকশনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বেশ কয়েকজন মহিলা মার্কের স্পেনীয় সংস্থার বিরুদ্ধে স্পেনের সর্বোচ্চ আদালতে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছেন। তাঁদের অভিযোগের তালিকা দীর্ঘ— বাজারজাত করার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যে জালিয়াতি, ইচ্ছাকৃত ভাবে ভোক্তা এবং চিকিৎসকদের ভুল তথ্য সরবরাহ করা, মুনাফার উদ্দেশ্যে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তথ্য সরবরাহ, ভোক্তাদের এই টিকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত না করা। এছাড়া স্পেনের মার্কের বিরুদ্ধে উৎকোচ দেওয়া এবং দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আদালতের ধারণা প্রাথমিকভাবে এই মামলা গ্রহণের পক্ষে প্রচুর যুক্তি রয়েছে এবং মামলা এখনও চলছে।

আদালত তদন্ত শুরু করলে জানা গেছে যে স্পেনে বালিকাদের ওপর পরীক্ষামূলক টিকাকরণ করতে গেলে তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে সজ্ঞান সম্মতিপত্র (informed consent) নেওয়া বাধ্যতামূলক—কিন্তু এক্ষেত্রে এই সম্মতি নেওয়া হয়নি। দেশের বিভিন্ন স্থানে টিকা নেওয়া বাচ্চারা একই জাতীয়

অসুখে পড়লে, তাকে টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বলে মার্ক বা স্পেনের স্বাস্থ্য দফতর জানাতে চায় নি, এমনকী, টিকাকরণ ক্ষেত্রে টিকা নেওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে সবার একই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও মার্ক তার কোনো দায় নেয়নি।

স্পেনের মহিলাদের দায়ের করা মার্কের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো প্রায় প্রতিটা দেশের মহিলাদের অভিযোগ, কেবল কতকগুলো ক্ষেত্রে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে নতুন নতুন অভিযোগ যুক্ত হয়েছে।

ফ্রান্স, নভেম্বর, ২০১৩ : ফ্রান্সেও মামলার সংখ্যা স্পেনের অনুরূপ। এই মামলা শুরু হওয়ার সময়ে ফরাসি সরকারের বেশ কিছু 'বিশেষজ্ঞ' চিকিৎসক গার্ডাসিলের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোকে নস্যাৎ করে দিয়ে নিদান দেন যে, যারা মামলা করেছে তারা সাধারণ রোগে আক্রান্ত, এর সঙ্গে গার্ডাসিল-এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। তদন্তের কাজ কিছুটা অগ্রসর হলে দেখা যায় যে এই চিকিৎসকদের প্রত্যেকেই মার্ক সংস্থার অনুদানে গবেষণার, অনেকেই মার্কের টাকায় বিদেশে গিয়ে গার্ডাসিল-এর 'স্বাস্থ্যসম্মত দিক নিয়ে গবেষণাপত্র পাঠ করেছেন।

কলম্বিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, অগস্ট ২০১৪ : গার্ডাসিলের দ্বিতীয় দফা ইঞ্জেকশন নেওয়ার পর একটা শহরের একটা বালিকা বিদ্যালয়ের ২০০ জন ছাত্রীই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ওই শহরের যে ২০০০ জন ছাত্রীকে (বয়স ৯ থেকে ১৫) এই দ্বিতীয় দফা দেওয়া হয়েছিল তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার হয়েছে। ১৫০ জনের পক্ষাঘাত হয়েছে, ৫০০ জন খিঁচুনির শিকার।

ডেনমার্ক, জানুয়ারি ২০১৪ : ডেনমার্ক তার নিজের দেশের সর্বজনীন টিকাকরণ প্রকল্পে গার্ডাসিলকে অন্তর্ভুক্ত করে। সরকারি টাকায় মার্ক-এর গার্ডাসিল খরিদ করে ডেনমার্ক তার দেশের ১২ থেকে ১৫ বছরের সমস্ত বালিকাদের টিকাকরণের কাজ শুরু করেছে। এর আগে গার্ডাসিলের এত বড়ো মাপের প্রয়োগ হয়নি। স্বভাবতই বিপুল পরিমাণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে। ডেনমার্ক সরকার প্রতি বছর তার নিজস্ব রিপোর্ট প্রকাশ করছে, যেখানে এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়টা নথিভুক্ত হচ্ছে। ডেনমার্কেও ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা এবং শিশুরা একজোট হয়ে মার্কের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করেছে—মামলার শুনানি চলছে।

ফিজি, নভেম্বর ২০০৮ : গার্ডাসিল ইঞ্জেকশন নেওয়ার পর পরই ফিজিতে পাঁচটা টিকাকরণ কেন্দ্রে মেয়েদের যৌনাঙ্গে আঁচিল- জাতীয় বস্তুর প্রাদুর্ভাব মহামারীর আকার ধারণ করে। এরপর সারা দেশেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফার ইঞ্জেকশনের পর এই রোগের মহামারী দেখা দেয়। শেষ দফার ইঞ্জেকশনের ফলে বেশির ভাগ বালিকার এখনও রোগ নিরাময় হয়নি। মনে রাখা দরকার, এই আঁচিল জাতীয় সংক্রমণের বিরুদ্ধেই গার্ডাসিল টিকার প্রতিরোধ করার কথা ছিল। ২০০৯ থেকে ফিজিতে গার্ডাসিলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় প্রায় ৫০ জন করে মৃত্যু বরণ করছে।

জাপান, মে ২০১৪ : জাপান সরকার গার্ডাসিলকে আর 'সক্রিয় ভাবে' টিকাকরণের আওতায় রাখবে না বলে ঘোষণা করেছে। এই টিকা নেওয়ার পর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা সরাসরি স্বীকার না করলেও জাপান সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই টিকা নিয়ে অসুস্থ নারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া শুরু করেছে।

বস্তুত জাপান এবং আমেরিকা পৃথিবীর সেই দুটো দেশ যারা গার্ডাসিলের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রোগীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য একটা 'ক্ষতিপূরণ অর্থকোষ' গড়ে তুলেছে। এই অর্থ জোগাচ্ছেন মার্কিন দেশ এবং জাপানের করদাতা জনগণ—যে মার্ক সংস্থার স্বেচ্ছাচারিতায় এই দুর্ঘটনা ঘটল, তাদের কোনো আর্থিক দায়দায়িত্ব রইল না। আমেরিকা এখনই এই কোষে ডলার বরাদ্দ শুরু করেছে— তারা বেশ ভালো করেই জানে যে আগামী বছরেই ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও বালিকার সংখ্যা বেশ কয়েক হাজারে পৌঁছোবে।

ভারতের কাহিনি

আমাদের এই হট্টমালার দেশ ''রিপাবলিক অফ স্ক্যাম' হিসেবে পরিচিত। অতএব আমেরিকায় যে প্রক্রিয়াকে মার্ক সংস্থা 'প্রমাণিত পদ্ধতি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ভারতে সেই প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ ঘটবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। মার্ক সংস্থা প্রথমে ভারতের কিছু বাছা বাছা বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকদের উৎকোচ দিয়ে হাত করে পাশাপাশি তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উচ্চপদে আসীন আমলাদের ঘুষ দিয়ে এই গার্ডাসিলকে ভারতের বাজারে সরকারি অর্থে চালু করার জন্য কমিটি বানানোর জন্য নিযুক্ত করে। অতঃপর 'বিশেষজ্ঞ' এই সমস্ত চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের সুপারিশে গার্ডাসিল টিকাকরণ এদেশে চালু হল।

ভারত একটা বিরাট দেশ, জনসংখ্যাও প্রচুর। ১ শতাংশ মানুষ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হলে তার জন্য সংখ্যাটা হবে বিপুল— বস্তুত ঘটেছেও তাই। প্রথম ধাক্কাতেই যে পরিমাণ মানুষ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার হয়েছেন, এত অনভিপ্রেত মৃত্যু এবং স্বাস্থ্যহানির ঘটনা সামনে এসেছে যে, সেই সব ঘটনার তদন্তের জন্য ভারত সরকার একটা সংসদীয় কমিটি গঠন করে।

আমরা এখন এই সংসদীয় কমিটির বিভিন্ন মন্তব্যের সারমর্ম তুলে ধরছি। যে কেউ ইন্টারনেটে Parliament of India, Rajya Sabha, Seventy Second Report বলে গুগুল সার্চ করে এই কথাগুলো দেখে নিতে পারেন। এই টিকার 'প্রদর্শনীমূলক প্রয়োগ'-এর প্রস্তাব আসে ২০১১ সালে। প্রস্তাবটা আসে, না, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে নয়—আসে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ বা আইসিএমআর-এর কাছে। প্রস্তাবক বিল গেটস্ ফাউন্ডেশন-এর পোষ্য সংগঠন 'পাথ' সংস্থা। যদিও সরকারি ভাবে প্রস্তাব আসে ২০১১ সালে, কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে ২০০৬ সাল থেকেই টিকার বেআইনি ভাবে প্রয়োগ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটেছে। এই বিষয়টা আইসিএমআর জানত, কিন্তু তারা কিছুই করেনি। যে ব্যক্তির মাধ্যমে আইসিএমআর-এর কাছে 'পাথ'-এর প্রস্তাব আসে তার বিরুদ্ধে উৎকোচ বিতরণের প্রমাণ রয়েছে।

আইসিএমআর 'পাথ' সংস্থাকে অন্যায্য সুবিধে দিয়েছে। যদিও এটাকে 'প্রদর্শনীমূলক প্রয়োগ' বলা হয়েছে, কিন্তু আইসিএমআর-এর মতে এটা টিকার তৃতীয় দফা বা ফেজ-৩ ট্রায়াল। ভারতের আইন মতে এই দেশে কোনো টিকার ফেজ-৩ ট্রায়াল চালাতে হলে সমতুল্য একটা ট্রায়াল আগে বয়স্কদের ওপর চালিয়ে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করে কেবলমাত্র তবেই টিকাটিকে শিশুদের ওপর প্রয়োগ করা চলবে।

এই বিষয়টাতে দুর্নীতির গন্ধ পেয়ে সংসদীয় কমিটি ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেলকে জেরা করে জানতে পারে যে মার্ক সংস্থা সত্যিই ভারতে একটা ফেজ-৩ ট্রায়াল চালিয়েছে, যার জন্য তার প্রয়োজনীয় অনুমতি ছিল না। ট্রায়ালটা চলেছে গুজরাটে এবং অন্ধ্রে—কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে এই ট্রায়াল স্থগিত হয়ে যায়। সংসদীয় কমিটি সঠিক ভাবেই আশঙ্কা করেছে

যে এই সব কাজ করা হয়েছে মার্ক সংস্থাকে মুনাফার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং যারা এই সুযোগ করে দিয়েছে তারা উৎকোচের বিনিময়েই তা করেছে।

সংসদীয় কমিটির আশঙ্কা যে অমূলক নয় তা পরবর্তী ঘটনা থেকে স্পষ্ট। ভারতীয় মান্য সংস্থা আইসিএমআর তার নিজের নাম ব্যবহার করে 'পাথ' সংস্থাকে এই সম্পূর্ণ বেআইনি ট্রায়াল সংগঠিত করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি টিকাকরণ বিষয়ে নজরদারির ভারতীয় সাংবিধানিক সংস্থাটিকে এড়িয়ে গিয়ে আইসিএমআর অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাট সরকারকে জানিয়ে দেয় যে 'আইসিএমআর পরিচালিত' এই ট্রায়াল-এ এই দুই রাজ্য সরকার 'স্বচ্ছন্দে' যোগ দিতে পারে। ভারতে যখন এই ট্রায়াল চালু হয়েছে, সেই সময় গার্ডাসিল টিকা হিসেবে আমেরিকা ছাড়পত্র পেলেও, ভারতে তখনও তা ছাড়পত্র পায়নি। ছাড়পত্র পাওয়ার প্রশ্নই নেই, কেননা ট্রায়াল শুরুর বহু দিন পরে কোম্পানি ছাড়পত্র পাওয়ার আবেদন করেছে।

ভারতে যখন এই টিকার বেআইনি ট্রায়াল শুরু হচ্ছে, তখনই আইসিএমআর-এর কাছে রিপোর্ট ছিল যে এই টিকার মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। সংসদীয় কমিটি যখন আইসিএমআর-এর কর্তাব্যক্তিদের জেরা করেন, তখন আইসিএমআর লিখিত ভাবে জানায় যে এই ট্রায়ালের পরিকল্পনা ত্রুটিপূর্ণ ছিল!

ভারতে ট্রায়াল চালানোর কিস্‌সা

গার্ডাসিল-এর ট্রায়াল চালানোর জন্য প্রথমে ১০৮ জনকে যেখান সেখান থেকে কোনো পূর্ব পরীক্ষা ছাড়াই বাছা হয়। নানা ধরনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং সরকারি প্রকল্প বলে এটাকে প্রচার করায় পরবর্তীকালে এই সংখ্যাটা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। আমাদের দেশে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের নিয়ম হল তা বয়স্কদের ওপর প্রয়োগের পর কম বয়সীদের ওপর প্রয়োগ করতে হবে। তাই আইন মতে আগে টিকা প্রয়োগ করতে হবে ১৩ থেকে ১৫ বছরের বালিকাদের ওপর, পরবর্তী ধাপে তা ৯-১২ বয়সীদের মধ্যে প্রযুক্ত হবে। কিন্তু সমগ্র বিষয়টা দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য একযোগে পুরো 'এজগ্রুপ'-এই এই টিকা প্রযুক্ত হয়।

আমাদের দেশের নিয়ম হল, ১৫ বছরের কম কাউকে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হলে তাদের অভিভাবকদের পুরো বিষয়টা, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সহ, ভালো করে বুঝিয়ে সজ্ঞান সম্মতিপত্র লিখিত ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। যে সম্মতিপত্রটা এই টিকাকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল তা ইংরেজিতে লেখা—স্থানীয় ভাষায় নয়। এগুলো পড়ে বাখ্যা করার কোনো সময়ও ছিল না।

এই সম্মতিপত্রে কী লেখা আছে তা স্বাক্ষরকারীদের কেউই বোঝেননি। তদুপরি, এই সম্মতিপত্রে বেআইনিভাবে আইসিএমআর এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ছাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। ফলে সবাই এটাকে পালস্ পোলিওর মতো একটা সরকারি প্রকল্প হিসেবে ধরে নেয়। সংসদীয় কমিটি তদন্তের সময় দেখেছে যে ৯৫ শতাংশ সম্মতিপত্রে সই এর পরিবর্তে রয়েছে টিপ ছাপ—কেউ এমনকি স্থানীয় ভাষায় সই দিতে পারেনি। এই অভিভাবকরা নবসাক্ষরও ছিলেন না।

যে সমস্ত সম্মতিপত্রে সই রয়েছে, সেগুলো বিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসের ওয়ার্ডেনদের সই রয়েছে—ছাত্রীদের বাবা-মা'র নয়। এই বেআইনি বিষয়টাকে আইনি সুরক্ষা দিতে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার দ্রুততার সঙ্গে একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করে ওয়ার্ডের সইকে বৈধ বলে দেয়। পরে অবশ্য এই বিষয়টা নিয়ে একজন আদালতের দ্বারস্থ হলে আদালত বলে যে বিজ্ঞপ্তিটি অসাংবিধানিক এবং তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

নিয়ম হল যে এই ট্রায়াল নৈতিকতা মেনে হচ্ছে কি না তা দেখার জন্য আইসিএমআর একটা কমিটি গঠন করে সেই কমিটির মাধ্যমে নজরদারি চালাবে। এই কমিটির একজন মুখ্য সদস্য হিসেবে নিয়োগপত্র পান দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স-এর স্ত্রীরোগ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ইনি ঠিক ওই সময়েই মার্ক কোম্পানির আর্থিক সহায়তা নিয়ে গার্ডাসিল-এর যে কোনো বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, সে বিষয়টা প্রতিষ্ঠা করার একটা গবেষণা প্রকল্পে কার্যরত ছিলেন। এছাড়াও তিনি মার্ক কোম্পানির আর্থিক সাহায্য নিয়ে (পরিভাষায় যাকে বলে 'স্পনসরশিপ') সিওল-এর একটা চিকিৎসক সম্মেলনে গবেষণাপত্র পাঠ করেন।

ট্রায়ালের ফল : ইন্দোরে যে ৪৪ জন বালিকার ওপর পরীক্ষা চলে তাতে 'প্ল্যাসিবো' (অর্থাৎ টিকার পরিবর্তে নিরপেক্ষ ও নিরাপদ, ওষুধ বা টিকা নয় এমন জিনিস ব্যবহার করা ও টিকার সঙ্গে তার কার্যকারিতা তুলনা করা) ব্যবহৃত হয়নি। এই ট্রায়াল বৈজ্ঞানিক দিক থেকে বিধিসম্মত নয়। এই ক্যাম্পেই টিকার 'ডোজ' বা পরিমাণ নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়— প্রথম ২০ জনের ওপর নানান ডোজ প্রয়োগ করার পর 'আসল' ডোজ নিরূপিত হয়। ১২ জন বালিকা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়ে—পরে ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে পড়ার সংবাদ আসতে থাকে।

সারা দেশ জুড়ে হিসেব করলে ততদিনে ৫০ হাজার টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। অবশেষে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে গার্ডাসিল সংক্রান্ত নানান অনাচার নিয়ে মামলা হয় এবং সুপ্রিম কোর্ট মামলা চালাতে থাকে। সেই মামলার সূত্রে জানা যাচ্ছে যে টিকাকরণের অব্যবহিত পর থেকে ২০ দিনের মাথায় অনেক বালিকা মৃত্যু বরণ করেছে, পক্ষাঘাতের খবর আসছে। এমনকি ১৫ বছরের বালিকার রজোনিবৃত্তি ঘটেছে। ২০০৮ থেকে ২০১২-র মধ্যে এই ট্রায়ালে

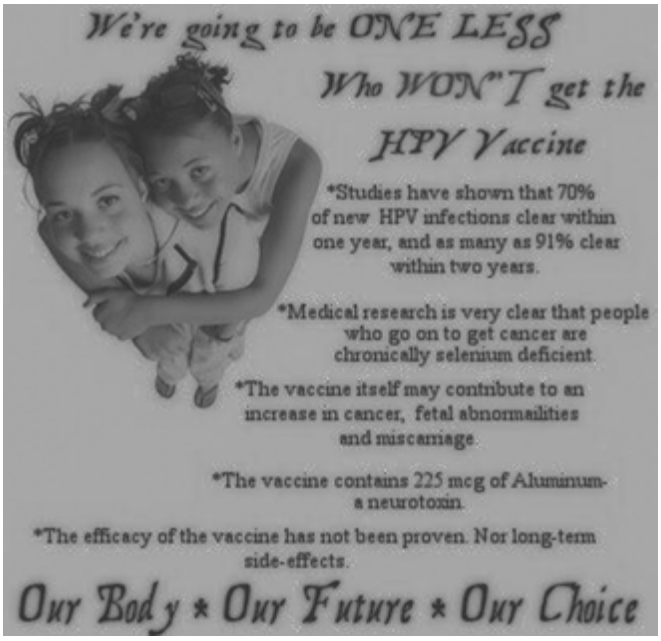

অংশ নেওয়া ১৩১৭ জন বালিকা মারা গেছে। এই তথ্য 'পাথ' এবং ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার হলফনামা মারফত সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে। যে 'ক্যানসারের বিরুদ্ধে' এই টিকাকরণের মহা আয়োজন, সুপ্রিম কোর্টে প্রদত্ত হলফনামা থেকে জানা যাচ্ছে যে সেই সারভাইক্যাল ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে ৬৭৯ জন বালিকা, যারা রজঃস্বলা হওয়ার আগেই এই টিকার পুরো তিনটে পর্যায় পেরিয়ে এসেছে! তাদের দেহে এইচপিভি অণুজীবের দুটো রকমফেরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বৃদ্ধির ইঙ্গিতও ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সারভাইক্যাল ক্যানসার প্রতিহত করা যায়নি। ১২০০ জনের শরীরে অপ্রত্যাহার যোগ্য ক্ষতি হয়েছে— তাদের বেশ কয়েকবছর ক্রমাগত চিকিৎসা করে যেতে হবে। অনাচারের তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়— কিন্তু উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

'পাথ' সম্পর্কে কয়েকটা কথা

এই সংস্থাটির ভারতের মাটিতে অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বেআইনি। ভারতে দফতর খুলে ক্রিয়াকলাপ চালানোর জন্য ভারতের বিদেশমন্ত্রক এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র এই সংস্থাটির নেই, যেমন একই ছাড়পত্র নেই কোনো জেহাদি সংগঠনের। ভারত সরকার এই সব জেহাদি সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে তাদের নিষিদ্ধ করেছে, সেই একই আইন 'পাথ' সংগঠনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সংস্থাটি সবদিক থেকেই সন্ত্রাসবাদী এবং অবশ্যই বিদেশি মদতে পুষ্ট। সুপ্রিম কোর্টের তলবের পর এই সংস্থাটি সম্পর্কে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক সময় (১৯৯৯ সালে) 'পাথ' সংস্থার বিদেশি মুদ্রা সংক্রান্ত একটা আবেদনের ভিত্তিতে সংস্থাটিকে জানায় যে সংস্থাটির ভারতে কাজ করার বৈধ ছাড়পত্র নেই, তবে বৈধ ছাড়পত্র পেলে তাদের আবেদন বিবেচিত হবে। তখন এই নিয়ে আর কিছুই হয়নি। ঘটনা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ানোর পর ভারতের বিদেশমন্ত্রক তড়িঘড়ি 'পাথ' সংস্থাকে চিঠি দিয়ে জানায় (চিঠির তারিখ ঠিক মামলার আগের মাসে, ২০১৪ সালে!) যে সংস্থাটিকে ১৯৯৯ সাল থেকে ভারতে কাজ করার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হল! ঠিক ধরেছেন, 'পাথ' সংস্থার এই ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন করার সময় ২০১১ সাল!

সাহারা মরুভূমির লাগোয়া আফ্রিকার একটা ক্ষুদ্র গরিব দেশের নাম চাড। 'পাথ' সংস্থার মুখোশ পরিহিত মস্তানবৃন্দ এক দিন ওই দেশের তুলনায়ও আরও গরিব একটা গ্রাম, গুইরোর একটা স্কুলে জিপগাড়ি চড়ে হানা দেয়— স্কুলের প্রায় ৫০০ বাচ্চাকে (সাতটা গ্রাম থেকে তারা পড়তে আসে) একটা ছোটো ঘরে গাদাগাদি করে আটকে রাখে। উদ্দেশ্য—এখন পর্যন্ত বাজারজাত হয়নি, ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি এমন একটা মেনিনজাইটিসের টিকা জোর করে তাদের দিয়ে দেওয়া। এক ঘণ্টার মধ্যেই ১১০ জন শিশু প্রবল মাথা ধরায় আক্রান্ত হয়— তারপর শুরু হয় মৃত্যুর মিছিল। ডাক্তার ডাকতে যাওয়ার নাম করে মুখোশধারীরা দূরের একটা গ্রামের দিকে রওনা দেয়— সেখানেও একই কাণ্ড ঘটে। মৃত্যু মহামারীর রূপ নিলে সপ্তাহখানেক বাদে ওই অঞ্চলে এক জন সরকারি ডাক্তার আসেন— কিন্তু তিনি এই মৃত্যুর মিছিল আটকাতে ব্যর্থ হন। ওই অঞ্চলে ততদিন 'মুখোশধারী ডাকাত'দের আবির্ভাবের খবর ছড়িয়েছে— একটা গ্রামে এই টিকাওয়ালাদের পদধূলি পড়লে গ্রামের মানুষ তাদের তাড়া করে। পালানোর সময় তারা গুলি চালায়— ৫০ জন গ্রামবাসী আহত এবং ১০ জন নিহত হন।

'পাথ' সংস্থাটি মোজাম্বিক-এ একটা ছোটোখাটো শিশু দাস শিবির চালায়। তারা এই শিবিরে শিশুদের স্রেফ দু'বেলা খেতে দেয়, ১২ ঘণ্টা খাটায় এবং কোনো মজুরি দেয় না। তাদের কাজ হল মনসান্টো ও অন্য একটা খাদ্যপ্রক্রিয়া-করণ সংস্থার 'ফুড সাপ্লিমেন্ট' নামক অবৈজ্ঞানিক 'খাদ্য' প্যাকেটজাত করা।

শেষ কথা

শেষের কথা স্পষ্টতই সামান্য। বিল গেট্‌স ফাউন্ডেশন সংস্থাটি তার পোষ্য 'পাথ' এবং 'জিএভিআই' সংস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের জোয়ার এনে এমন একটা রোগকে মহামারী বলে প্রমাণ করতে চাইছে, যার প্রতিরোধের বিষয়টি আদতে একটা সামাজিক এবং জনস্বাস্থ্যের বিষয়।

এই রোগটার প্রতিরোধে পুষ্টিকর খাদ্য, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, যৌনতার ক্ষেত্রে কিছু বিধি, আর স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রভাব প্রমাণিত। পশ্চিমি দেশে বা এশিয়া ইউরোপের বিত্তশালী দেশগুলোতে এই রোগের শিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নারীরা, যাঁদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, নেই পর্যাপ্ত খাদ্য বা নিয়মিত জীবিকা। আমাদের দেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, অন্ত্যেবাসী নারীরা এই রোগের শিকার। সারভাইক্যাল ক্যানসার (বা ভাইরাস ঘটিত আঁচিল) থেকে পরিত্রাণের রাস্তা টিকাকরণ নয়, কেননা দারিদ্র আর বঞ্চনা কোনো রোগ নয়, এটা সমাজ দেহের রোগের ফল মাত্র।টিকাকরণের সংস্থাগুলো চায় যে এই অস্বাস্থ্যকর, অসাম্যে ভরপুর পরিবেশ টিকে থাকুক। তারা টিকাকরণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আরও বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং মুনাফা লুঠছে। বিজ্ঞাপনের জৌলুসে ভুলে আমাদের সুস্থ কন্যাদের টিকা দিয়ে অসুস্থ বানানোর বদ মতলব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সময় হয়েছে।

লেখক পরিচিতি : শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব-পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক

কোরপান-এর হত্যা : মূল্যবোধের চেনা ছক ভেঙে কিছু অচেনা প্রশ্ন

ডা. রাতুল ব্যানার্জি

কোরপান শাহ থমকে দিয়েছে আমাকে, আমাদের ... খুন অথবা গণপিটুনিতে মৃত্যু মাঝে মাঝেই ঘটে, তবু এনআরএস-কোরপান কোথাও যেন অনেকটা আলাদা, অনেক বেশি ধাক্কা দিয়েছে আমাদের 'মধ্যবিত্ত' মননে। কারণটাও অবশ্য খুব স্বাভাবিক, এখানে 'সংগঠিত হত্যাকারীরা' আমাদের শ্রেণি তথা বর্গের অর্ন্তগত। 'আমি' মুর্শিদাবাদের কোনো এক অজ গ্রামের গণপিটুনিতে চিন্তিত কম হই, কারণ 'আমি' 'ওদের' সঙ্গে নিজেকে জুড়তে বা জড়াতে স্বচ্ছন্দ নই হয়তো। আর দ্বিতীয়ত এখানে হত্যাকারীরা ছাত্র বিশেষত ডাক্তারি ছাত্র, যাদের থেকে আমাদের 'মানবিকতা মূল্যবোধের' আশা একটু বেশিই...

এহেন নারকীয় হত্যার ঘটনার নানা জটিল মনস্তাত্ত্বিক বাখ্যা হাজির করছেন মনোবিদ ডাক্তারবাবুরা ... 'mob psychology', 'shared interest' সব জটিল জটিল ব্যাপার-স্যাপার ...। হয়ত ঠিকও, কিন্তু এটা কোরপান না হয়ে ওই মুহূর্তে ধরা পড়া কোনো 'বেশভূষা' সম্পন্ন যুবক হলে কী হত? আমি নিশ্চিন্ত তখন ওই shared interest বা mob psychology এক ভাবে কাজ করত না। এখানেই শ্রেণি বা বর্গ সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে এই সব mob expression-এ। আর শুধু রাষ্ট্র বা পার্টি নয়, তথাকথিত 'জনগণ'ও কখনও-সখনও রেজিমেন্টেড হয়ে আগ্রাসী অবদমনকারি ক্ষমতার (power) 'mob' হয়ে ওঠে নির্দিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে, এই ধরনের ক্ষমতার প্রতিটা অবদমনে লুকিয়ে থাকে শ্রেণি, জাতপাত, বর্গ বা লিঙ্গের প্রশ্ন।

এই ঘটনার পরে অনেকেই মূল্যবোধ মানবিকতা এসবের অধঃপতনে নিয়ে খুবই চিন্তিত দেখছি। 'মূল্যবোধ' জিনিসটা কোনো স্বয়ম্ভু বস্তু নয়, বিহারের গ্রামে নিচু জাতের মেয়েকে সংগঠিত ভাবে ধর্ষণ করাটা এই একবিংশ শতকেও উঁচু জাতের মূল্যবোধে রয়েছে, তার পালটা মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে দলিত

সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই। অযাচিত ভাবে বিয়ে করলে অনার কিলিংটা খাপের মূল্যবোধে আছে, যেমন আছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর moral policing, ওগুলোকে আটকাতে গেলে সংগ্রাম লাগে। ঠিক একই ভাবে কোরপানদের অধিকারও কোনো স্বয়ম্ভু 'মানবিক মূল্যবোধ' দিয়ে রক্ষিত হবে না, ওর জন্যও সংগ্রামই লাগবে ... ভুল হলে রিকশাওয়ালাকে চড় মারা বা 'কাজের মেয়েকে' কে শাস্তি দেওয়া 'আমাদের' জন্মগত অধিকার, ওটুকু তো করতেই হয় সিস্টেম চালানোর জন্য। আমি আমার সাপ্তাহিক ছুটি নিয়ে খুব চিন্তিত, কিন্তু ড্রাইভার বা কাজের লোকের ছুটির দাবি নিতান্তই অস্বাভাবিক ঠেকে আমাদের দৈনন্দিনতায় ... সংগ্রাম লাগবে এই মূল্যবোধটার বিরুদ্ধে, তীব্র সংগ্রাম, শুধু (আনন্দ) বাজারীয় সচেতনতা দিয়ে ঘুচবে না এটা কখনও...।

ঘটনাটার পরে অনেক ফোন ও এসএমএস পেয়েছি। সবাই খুব চিন্তিত ডাক্তাররা এত 'অমানবিক' কী করে হয় ... ২৪ ঘণ্টার অনুষ্ঠান সঞ্চালিকা খুব চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, ''এর ফলে ডাক্তারির মতন মহান পেশাটা কলুষিত হল না...'' মহান পেশা ঠিক কাকে বলে বলুন তো? অতীতে এই পেশায় যে দায়বদ্ধতা জড়িয়ে ছিল, সেটা নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের কারণেই ছিল, সেই সম্পর্ককেই আপনারা 'মহান' বলেছেন। আগে একজন ব্যক্তি ডাক্তার অনেকটাই তাঁর উদ্যম উদ্যোগের ওপর ভিত্তি করে পেশাটা চালাতে পারতেন। ওষুধ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবেতেই তার নির্ধারক ভূমিকা ছিল অনেকটাই বেশি। আর বাকিটা চলত সরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে। মানুষ নির্ভর ছিলেন ব্যক্তি ডাক্তারের ওপর, বিনিময়ে অনেকটা সম্মান পেতেন তাঁরা। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যক্তি ডাক্তারের এই নির্ধারণের ক্ষমতা কমেছে বহুগুণে—তাই 'মানবিকতা মহত্ব' আজ এই পেশায় খুব অগোছালো এক ধারণা, কিছুটা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের মতো। ডাক্তারের কাছে গেলে সে যে টেস্ট করতে দেবে, যে ওষুধ লিখবে, যেখানে ভরতি হতে বলবে, অপারেশান করাতে বলবে—সেইসব ব্যবস্থাগুলো পুঁজির নিয়মে চলে, চলে মুনাফা লুটের নিয়মে, সেখানে ব্যক্তি ডাক্তারের সত্যাগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু খুবই নগণ্য। আর আজকের যুগে অন্য কোনো 'পেশা' যখন সত্যাগ্রহে নামেনি তা হলে এই সব ডাক্তাররাই বা নামবে কেন একা একা, কোনো বিকল্প স্বাস্থ্য আন্দোলন ছাড়া? আপনাদের ভাষায় 'মহত্ব' থুড়ি পুরোনো সম্পর্কটা রাখার তাগিদটা কোত্থেকে আসবে..

এইসব চেনা ছক পেরিয়ে ডাক্তার ও রোগীর সম্পর্ক নতুন চেতনায় লিখতে হবে আমাদের, আর সেই চেতনা একমাত্র আসতে পারে এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বদলের দাবিতে পথে নামার মধ্যে দিয়ে, বিকল্পভাবে বিকল্পের জন্য জনস্বাস্থ্য আন্দোলন গড়ে তোলার মধ্যে দিয়েই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পণ্যায়ন- নিমিত্ত বর্তমান নৈতিকতাকে অতিক্রম করতে পারে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের অধিকারের চেতনাই, এর মধ্যে দিয়েই নির্মিত হতে পারে ডাক্তার রোগীর সম্পর্কের নতুন বিন্যাস। বর্তমান ভারতীয় সামাজিক অর্থনৈতিক পরিসরের যেভাবে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে প্রতিদিন, তাতে এই ব্যবস্থায় সমস্ত পেশার পরিণতি প্রায় একটাই, নিছক আর্থিক সম্পর্ক। যখন পেশাগত সাফল্যটাও কর্পোরেট পুঁজির যুক্তির সঙ্গে মিলেমিশে যায় তখন কে মহান আর কে শয়তান! স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে কর্পোরেট পুঁজির অবাধ চলাচলের জন্য হেলথ ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত করবেন আর তাতে থাকা ডাক্তারদের 'মানবিকতা' নামক ডুমুরের ফুল চলে গেল বলে নাকি কান্না কাঁদবেন, এই ভাবের ঘরে চুরি আর কতদিন!!! যদি ওই 'মানবিকতা'ও বাঁচাতে চান তবে রাস্তায় নামুন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের কর্পোরেটকরণের এর বিরুদ্ধে ...

প্রথমে বেশ অবাক লাগছিল—কিছু ছেলে নয় মারছিল, কিন্তু এত বড়ো হোস্টেল এত ছাত্র সেখানে, তারা সব কোথায় গেল? মারার পরও কেউ গেল না কোরপানকে দেখতে? অথবা ওই ঘটনার পরও হোস্টেলের সবার সব যেন ঠিক চলছে। কী অদ্ভুত নৈঃশব্দ, কী অদ্ভুত 'নিষ্পাপ অজ্ঞতা'... মনে পড়ছিল নিজের ডাক্তারি শিক্ষার সাড়ে ছয় বছরের অভিজ্ঞতা। 'শরীর তোর মন কোথায়' - বইয়ের পাতায়, ক্লিনিকস এর ক্লাসে হাতড়ে বেড়িয়েছি সেই মন, মানুষ তো এখানে শুধুই শরীর, জটিল অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, এই সবের নির্মাণ। হাজার হাজার মেডিক্যাল বইয়ের পাতায়, হাজার ঘণ্টা ক্লাসের কতটুকু ব্যয় করি আমরা 'মানুষ' জীবটার সুখ, দুঃখ, সমাজ সমস্যা নিয়ে? মানুষ প্রায় একটা মেশিন আমাদের কাছে, দেকার্তে যেমন বলেছিলেন, আর আমরা তার খুঁত মেরামত করি। ওয়ার্ডে গিয়ে প্রতিটা আর্তনাদকে আমরা অগ্রাহ্য করতে শিখি, কারণ ওই আর্তনাদ দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেই সরকারি হাসপাতালে। আমার ব্যক্তিগত সংবেদনশীলতা ওখানে টিকে থাকার জন্য একটা নেতিবাচক অভিযোজন, কারণ শুধু ওটা দিয়ে মিটবে না কোনো আর্তনাদ, শুধু শুধু আর্তনাদ বাড়বে আমার মনেও। নতুন ইন্টার্নরা যখন জরুরি বিভাগে যায় তখন তাদের ট্রেনিং নিতে হয় 'ব্যাটিং' শেখার। 'ব্যাটিং' মানে আগত রোগীকে ছলে বলে কৌশলে শান্তি বজায় রেখে ভর্তি না নিয়ে বিদায় জানানো। ভর্তির জন্য বেড খালি ৬টা আর ভর্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে রোগী আসবে ৬০ জন, এরকম ক্ষেত্রে একটা মানসিকতাই তোমাকে বাঁচাতে পারে, 'নিষ্পাপ অজ্ঞতা'... অভিরামপুর গ্রাম থেকে ১০০ টাকা দিয়ে ভ্যানে তারকেশ্বর রুরাল হাসপাতাল, সেখান থেকে রেফার হয়ে চুঁচুড়া ইমামবাড়া, সেখানেও সামলানো গেল না তাই রেফার মেডিক্যাল বা এনআরএস বা অন্য শেষ স্তরের হসপিটাল, অজস্র টাকা সময় ব্যয় করে ভর্তি প্রত্যাশী রোগীর আত্মীয় যখন মেডিক্যাল কলেজগুলোয় পৌঁছোয় তখন তাদের উৎকণ্ঠাভরা চোখগুলোর সামনে 'Regret, no bed vacant' (দুঃখিত, বেড খালি নেই) লিখতে 'অমানবিকতা' নিয়ে শিক্ষিত হতে হয়েছিল, নিজেকে অভিযোজিত হতে হয়েছিল অজ্ঞতা ignorance এর আত্মরক্ষায়। আমাদের ডাক্তারি শিক্ষার পাঠক্রম আমাদের অনেক জ্ঞানের সঙ্গে নিঃশব্দে ওই ignorance ওই অমানবিকতার ট্রেনিংটাও দেয়, আর এই ignorance বৈধ্যতা দেয় হিংসাকে... তাই বোধহয় কোরপান এনআরএস-এর ছাত্রগুলোর জীবনে আর একটা 'স্বাভাবিক' ignored কেস। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের ignorance এর এই স্বাভাবিকত্বটাকে ভাঙতে হবে, আর ওটাকে ভাঙতে গেলে লাগবে হাজার পাগলের, হাজার কোরপানদের বিস্ফোরণ...

বি.দ্র : ঘটনার পরে প্রায় এক মাস কেটে গেলেও একজন ছাত্র এখনও গ্রেফতার হয়নি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, এমনকী পরীক্ষার অজুহাতে সময়ের অভাবে চলছে না কোনো প্রকৃত তদন্ত। এই ব্যবস্থায় হবু ডাক্তারদের সময়ের দাম নিঃসন্দেহে একটা জীবনের থেকে দামি!!! কিন্তু আটক করা হয়েছে ক্যান্টিনের দু'জন কর্মচারীকে ... হোস্টেলের 'ক্ষমতা কাঠামোয়' ওরাই সবচেয়ে নীচে থাকে তো, ঘটনায় হয়তো বা যুক্ত না থাকলেও তাই ওরাই সবচেয়ে সহজ শিকার রাষ্ট্রের ... 'আমাদেরও', তাই না...

লেখক পরিচিতি : ডা. রাতুল ব্যানার্জী, এমবিবিএস, গণ-আন্দোলন ও ছাত্র-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত

কোরপান শা-র মৃত্যু ও তাঁর বাড়ির কিছু কথা

ডা. গর্গ চ্যাটার্জি

খবরটা পেয়েছিলাম ইন্টারনেটে বসেই। প্রথমে শুনলাম একজন পুরুষ মোবাইল চোর নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ধরা পড়েছে এবং গণপিটুনিতে মারা গেছে। 'গণ' বলতে 'জুনিয়র ডাক্তার'। তারপর জানলাম যে বেশ অত্যাচার করেই মারা হয়েছে, বিশেষত তাঁর যৌনাঙ্গে নানা অত্যাচার চলেছে— কেটেও ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু গণপিটুনি না, কিছু বিকৃতকাম ভাবনা ও অন্যকে কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা, এই দুই-ই এক সঙ্গে চরিতার্থ হয়েছে মানুষটার ওপর। তারপর জানা গেল এই মানুষটা কোরপান শাহ। কেমনে জানা গেল? টিভির কল্যাণে।

উলুবেড়িয়ার কাছে শা-পাড়াতে এক অন্তঃসত্ত্বা বধূ অপেক্ষা করছিলেন তার নিখোঁজ স্বামীর জন্য। বুঝলেন ওই ব্যক্তিই তাঁর স্বামী। মানসিক রোগের জন্য চিকিৎসা চলছিল তার। ২-৩ দিন আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এমন আগেও হয়েছে। এবার আর ফেরা হল না।

ঘটনাটার বীভৎসতার জন্যই হোক আর তথাকথিত 'মনুষ্যরূপী দেবতা'

অর্থাৎ ডাক্তারদের জড়িয়ে থাকার ব্যাপারটাই হোক, একটা ছিছিক্কার পড়ল। আমিও বিচলিত ছিলাম, তবে অন্য কারও থেকে বেশি বা কম বিচলিত ছিলাম এমন না। এই ঘটনার ক'দিন বাদেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের স্টুডেন্টস ইউনিয়ন নির্বাচন। মেডিক্যাল কলেজ ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বা এমসিডিএসএ-র একদা সদস্য থাকার কারণে সেই সংগঠনের ফেসবুক

গ্রুপে আমার আনাগোনা, খবরাখবর নেওয়া। শুনলাম মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর নীলরতনের সামনে প্রতিবাদ জমায়েত করবে। এমসিডিএসএ-এর সঙ্গে এখন যুক্ত বা একদা যুক্ত ছিল যাঁরা, তাঁরা যেন আসেন, এই আশায় আহ্বান করলাম, অর্থাৎ ফেসবুক গ্রুপে 'পোস্ট' করলাম। তাতে দেখলাম কিছু স্বর, যেখানে এই প্রতিবাদের বিরোধিতা করা হল। এরই মাঝে আমার জুনিয়র অভিষেক মুখোপাধ্যায় 'প্রাইভেট মেসেজে' জানাল যে কোরপানের পরিবারের জন্য যদি অর্থ সাহায্যের একটা উদ্যোগ নেওয়া যেত ভালো হত। আমি আইডিয়াটা লুফে নিলাম। পরে জেনেছি যে আইডিয়াটা এসছিল বেল্লাল আলি-র কাছ থেকে, যে কি না মেডিক্যাল কলেজ মেন হোস্টেলে অভিষেকের রুমমেট।

ফেসবুকে একটা 'ইভেন্ট' পেজ তৈরি করলাম। বিদেশে থাকার সময় ফেসবুকে সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কোনো কিছুর জন্য টাকা তোলার অভিজ্ঞতা ছিল— আগে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের সময়ে, পরে চেঙ্গাইলের শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ— ইত্যাদির জন্য কিছু কিছু টাকা তুলেছি। তবে এবার অবস্থা ছিল আলাদা। কারণ যে শহরে বসে এটা করছি, ঘটনাও সেখানের এবং ঘটনাটি টাটকা। তা ছাড়া 'ডাক্তার'-রা জড়িত। একদা ডাক্তারি পড়ার কারণে মনে হল, আমাদের একটা দায়িত্ব থাকুক এতে— যদিও তাতে অনেক ডাক্তারের কমিশন খাওয়া রক্তপিপাসু পরিচয় বা আচরণ কিছুই তাতে বদলাবে না। ফেসবুকে দিলাম অ্যাপিল। বললাম, যাঁরা যাঁরা অর্থ সাহায্য করতে চান মৃতের পরিবারকে, তাঁরা আমাকে জানান এবং কত দেবেন, তাও জানান। আস্তে আস্তে সে আহ্বানের উত্তর এল— প্রথমে কিছু তারপর অনেক। ফেসবুকে বেশ দ্রুত ছড়াল এই টাকা তোলার খবর। ভেবেছিলাম হাতে হাতে হাজার দশেক মতো টাকা উঠবে। দেখলাম দূর থেকে মানুষ টাকা দিতে চাইছেন। দিলাম আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য। সেখানেও টাকা আসতে লাগল। আর তার সঙ্গে অনেক প্রশ্ন, অনেক শুভেচ্ছা, অনেক খোঁজ। আমাকে সারাক্ষণ উত্তর দিতে হচ্ছে তখন, কারুর টাকা এল কি এল না, সেই মর্মে রীতিমত লিস্ট করে বসে আছি সারাদিন। ফেসবুকে জানাচ্ছি, যেমন টাকা আসছে, বলছি, এখন পর্যন্ত কত উঠল, ইত্যাদি। এই উদ্যোগের কথা ছড়াতে খুবই সাহায্য করেছেন সাংবাদিক মধুমিতা দত্ত। টাকার অঙ্ক তরতরিয়ে বাড়তে থাকল। এরই মধ্যে আমাদের এই প্রচেষ্টার কথা 'এবেলা' ও হিন্দি, এই দুই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। বাংলা, ভারত, আমেরিকা ও ইংল্যান্ড থেকে মানুষজন টাকা দিলেন। এখন পর্যন্ত উঠেছে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মতো। এই পত্রিকার যারা পাঠক, যাদের মধ্যে হয়তো অনেক মানবদরদী ডাক্তার/অ-ডাক্তার মানুষ আছেন, তারাও যদি এই ফান্ডে কিছু দিতে চান, তারা আমার drgarga@gmail.com ইমেল-এ যোগাযোগ করুন।

এরই মাঝে আমি মৃতের পরিবারের এলাকায় থাকা, পাড়া-সম্পর্কের এক মামার সঙ্গে যোগাযোগ করি। উনিই বলেন বাড়ি কোথায় ইত্যাদি। আমি অনুরোধ করি যেন কোরপান শা-এর স্ত্রীর নাম একটা সিঙ্গল অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা হয় স্থানীয় কোনো ব্যাংকে। উনি সে ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিত করেন। মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগও মূলত ইনিই রাখছিলেন তখন। আমি, মানসিক স্বাস্থ্যকর্মী রত্নাবলী রায় ও নারী অধিকার কর্মী অধ্যাপিকা উত্তমা রায় গাড়ি যোগে উলুবেড়িয়া যাই। আমরা সেখানে মৃতের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি। অসামান্য মনের জোর ওঁর। খুবই রুগ্ন উনি— ঠিকঠাক খাবার জুটছে না। রত্নাবলীদি জিজ্ঞেস করেন, ''এই যে নানা লোকে এসে নানাবিধ প্রশ্ন করছে, ইচ্ছে করছে না নিশ্চয়?'' উনি উত্তর করেন, ''আমি রা না কাড়লে কী করে হবে?'' আমাদের সকলকে লজ্জিত করে দেয় এই অকপট উক্তি। আমরা ২০০০০ টাকা হাতে-হাতে দিয়ে দিই। আর বলি যে বাকি টাকা ক'দিন বাদে, মৃতের কাজকর্ম মিটে গেলে, উত্তমাদির সঙ্গে মৃতের স্ত্রীর জয়েন্ট ভাবে স্থায়ী আমানত করে রাখা হবে একটু দীর্ঘ মেয়াদে। মাঝের সময়ে কিছু টাকা আমরা দিলাম। কিছু দিয়েছেন কংগ্রেসের ওমপ্রকাশ মিশ্র। শুনছি সিপিএম-ও নাকি ঢাকঢোল পিটিয়ে মঞ্চে এনে কিছু দেবে। সে যে ধান্দাতেই হোক, দিলেই মঙ্গল। আমার সীমিত অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত দলের অনেক কমরেডই সাধারণত মানবমুক্তির জন্য প্রাণ দেওয়ার অঙ্গীকার করেন, রক্ত দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তার কিছুটা এখানে কাজে লাগলে ভালো।

টাকাটা যেন কোরপানের স্ত্রী ও তার সন্তানদের হাতে থাকে, তাদেরই কাজে লাগে। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মে শুনলাম ২৫০০০ টাকা খরচা হয়েছে। আমি বাইরের লোক। স্পষ্ট বলা ভালো যে মৃতের পরিবারের মাঝে মাঝেই খোঁজ নেওয়া আমার দ্বারা হবে না, অচিরেই অন্য নানা কিছুতে নিজেকে নিয়োজিত করে ফেলব। কিন্তু টাকাটা আশা করি কিছু কাজে লাগবে। বেল্লাল আমাকে জানিয়েছে যে বাগনানে একটা আবাসিক স্কুলে বড়ো দুই সন্তানের ভর্তির একটা চেষ্টা ও করবে। তা নিয়ে যোগাযোগ করা বাকি আছে। অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী যে কোনো দরকারে চেঙ্গাইলের শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারেন। ড. পুণ্যব্রত গুণের মোবাইল নম্বর ওঁদের দিয়ে এসেছি।

কোরপানের স্ত্রী বোধ হয় নিরক্ষর। ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত হবে টিপ-ছাপেই। কিন্তু তাকে আস্তে আস্তে সবই শিখে নিতে হবে। আমরা এই মর্মে তাকে বলতে, বড়ো ছেলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল 'মা, আমি তোমাকেই সই করা শিখিয়ে দেব'। তার জন্য, তার ভাইবোনেদের জন্য, এখনই ভুমিষ্ঠ না হওয়া অনুজের জন্য এবং তাদের মায়ের জন্য রইল দূর থেকে শুভেচ্ছা। দেড় লক্ষ টাকায় পাপ-স্খালন অসম্ভব। দেড় লক্ষ টাকা কেন, কোনো পরিমাণ টাকা দিয়েই পাপস্খালন হবে না, কোরপানের জীবন ফিরবে না বা তার মূল্য দেওয়া যাবে না— সেটা আমরা ভালোই বুঝি। ব্যক্তিগত-সমষ্টিগত অনেক পাপ আছে আমার, হয়তো বা অন্যদের। আমার কিছুটা সেই পাপস্খালনের অক্ষম প্রচেষ্টা থেকেই এটা করা, যেটা কি না নিজের পিঠ চাপড়ে আমরা বলে থাকি 'পাশে দাঁড়ানো'। আমি বা আমরা পাশে দাঁড়াইনি। বাড়ি গিয়ে কিছু সময় সামনে বসেছিলাম। আবার যাব এক-দুইবার। এই আর কী!

লেখক পরিচিতি : ডা. গর্গ চ্যাটার্জি, এমবিবিএস, পিএইচডি, কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ সহকারী অধ্যাপক।

যোগাযোগ : drgarga@gmail.com (ইমেল)

মূত্রে রক্ত বা হিমাচুরিয়া—কিছু জানার কথা

মূত্রের সঙ্গে রক্ত। কখনও তা চোখে দেখা যায়, কখনও বা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণে লোহিত রক্তকণিকা পাওয়া যেতে পারে। এর অনেক রকম কারণ হতে পারে। মূত্রে রক্ত বা হিমাচুরিয়া যত সামান্যই হোক না কেন, উপেক্ষা করবেন না— লিখছেন **ডা. সৌম্যকান্তি বাগ।**

তখন সবে ইন্টার্নশিপ শুরু হয়েছে। শনিবার দুপুরের ইমার্জেন্সি ডিউটি দিচ্ছি। জলস্রোতের মতো পেশেন্ট ঢুকছে। তিনজন ইন্টার্ন মিলে হাবুডুবু খাচ্ছি। হঠাৎ-ই মোটরবাইক অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া এক বছর চব্বিশের যুবককে নিয়ে হাজির আরও জনা কুড়ি যুবক। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সবাই মিলে টানতে টানতে নিয়ে গেল রোগীর কাছে। ঘাবড়ে না গিয়ে পরীক্ষা করা শুরু করলাম। মাথায় তেমন গুরুতর চোট নেই। শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক। কোথাও হাড়ও ভাঙেনি। ছোটোখাটো কাটা-ছেঁড়াগুলো সেলাই করে, টিটেনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে ইমার্জেন্সি টিকিটে লিখে ওষুধপত্র দিয়ে ফিরে বিদায় দিতে যাব, যুবকটি বলল বাথরুম যাব। বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে সবে চেয়ারে একটু গা এলিয়েছি, হঠাৎ গোটা দলটা দৌড়ে এল আবার ----''ডাক্তার বাবু, পেচ্ছাপের সঙ্গে কাঁচা রক্ত বেরোচ্ছে।" হাত, পা ঠান্ডা হয়ে এল এবারে। তখন ব্যান্ডেজ করে বা সেলাই দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্তপাত থামাতে শিখে গেছি। কিন্তু এখানে ব্যান্ডেজই কোথায় বাঁধব আর সেলাইটাই দেব কোথায়! চারপাশে চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘামছি— হঠাৎ দেবদূতের মতো দেখা পাওয়া গেল সুজয়দার, সার্জারির পি.জি.টি। ডেকে এনে দেখাতে বলল ''চিন্তার কারণ নেই— সাবধানে ক্যাথেটার পরিয়ে ব্লাডার ইরিগেশান দে। তবে জোর করে ক্যাথেটার ঢোকাতে যাস না...''। তারপর যেই কথা সেই কাজ। সবকিছু করে রোগীকে সার্জারি ওয়ার্ডে ভর্তি করে দেওয়ার পর মনে হল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* সম্পাদক মশাই যখন হিমাচুরিয়া নিয়ে লিখতে বললেন, তখন আমার প্রথমেই এই ঘটনাটাই কেন মনে পড়ল তা ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী মাত্রেরই অজানা না। গল্প তো হল, এবার তা হলে পড়াশুনা করা যাক।

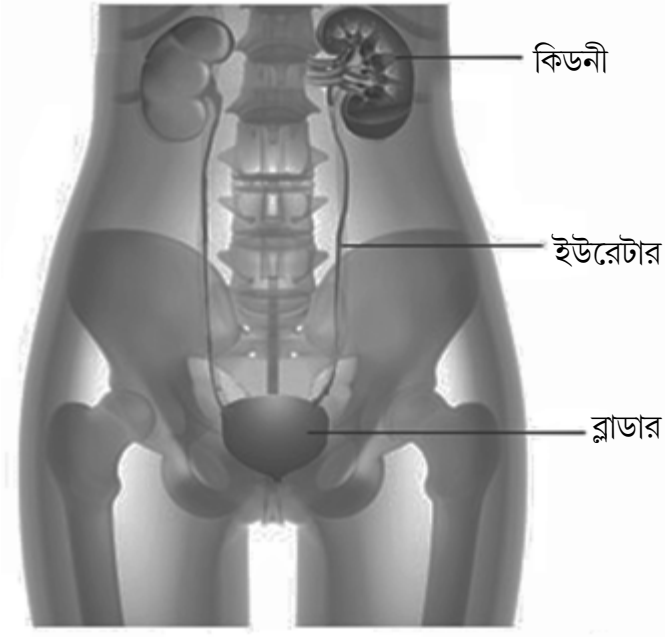

মূত্রতন্ত্রের গঠন

হিমাচুরিয়ার রকমফের

আসুন দেখা যাক হিমাচুরিয়া বা মূত্রদ্বার দিয়ে রক্তপাত ক'রকম এবং কী তাদের গুরত্ব। যে রক্ত মূত্রের সঙ্গে খালি চোখে দেখা যায়, তাকে আমরা বলি ম্যাক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া, আর খালি চোখে দেখা যায় না কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মূত্র নিয়ে পরীক্ষা করলে লাল রক্ত কোষ (RBC) দেখা গেলে তা হল মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া। অনেক সময় কিছু খাবার (যেমন বিট), কিছু ওষুধপত্র (যেমন পাইরিডিয়াম, ফিউরাড্যান্টিন, রিফামপিসিন) খাওয়ার জন্য লালচে মূত্র হতে পারে, কিন্তু সেটা হিমাচুরিয়া নয়।

হিমাচুরিয়ার কারণ

এবার দেখি কী কী কারণে হিমাচুরিয়া হয়। আমাদের রেচনতন্ত্রের মূল অংশগুলো হল যথাক্রমে কিডনি বা বৃক্ক, গবিনী বা ইউরেটার, মূত্রথলি বা ইউরিনারী ব্লাডার, এবং সবশেষে মূত্রনালী বা ইউরেথ্রা। এদের যে কোনো অংশে রক্তপাতের কারণেই হিমাচুরিয়া হতে পারে। এছাড়া পুরুষদের মূত্রনালীর প্রথম অংশ ঘিরে আছে প্রস্টেট গ্রন্থি—এর রোগ বা আঘাতের কারণেও হিমাচুরিয়া হতে পারে। হিমাচুরিয়ার কারণগুলো হল—

১. সংক্রমণ বা ইউরেনারী ট্রাক্ট ইনফেকসন (UTI) ----এটি রেচনতন্ত্রের যে কোনও অংশেই হতে পারে। কিডনি হলে তাকে আমরা বলি পায়েলোনেফ্রাইটিস (Pyelonephritis), মুত্রথলিতে হলে সিসটাইটিস (cystitis), মূত্রনালীতে হলে ইউরেথ্রাইটিস (Urethritis)।

২. আঘাত— এটাও কিডনি, মুত্রনালী বা মুত্রথলি যে কোনও জায়গায় হতে পারে। সাধারণত পেটে চোট লাগলে কিডনিতে আঘাতের সম্ভাবনা বেশি, আর তলপেটে চোট লাগলে বা কোমরের হাড় ভাঙলে (pelvic fracture) মুত্রনালী বা মুত্রথলিতে আঘাত লাগতে পারে। এক্ষেত্রে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়ে শক্ (shock) এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।

৩. পাথর— কিডনি, ইউরেটার বা মূত্রথলিতে পাথর থাকলে রক্তক্ষরণ হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে রক্তক্ষরণ পরিমাণে কম হয়।

৪. টিউমার বা ক্যান্সার— বিভিন্ন টিউমার ক্যানসারে হিমাচুরিয়া হয়। যেমন, কিডনির ক্যানসার বা রেনাল সেল কার্সিনোমা (Renal Cell Carcinoma), কিডনির অন্যান্য টিউমার (যেমন শিশুদের উইলমস্ টিউমার—Wilm's tumour), ইউরেটারের এবং ব্লাডারের ক্যানসার (ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা— Transitional Cell Carcinoma)। ব্লাডারের টিউমার বা ক্যানসার হয় সবচেয়ে বেশি।

৫. টিবি (Tuberculosis)— সাধারণত কিডনিতে হয়, তবে অন্যান্য অংশগুলিতেও হতে পারে।

৬. প্রস্টেটের অসুখ— বিনাইন প্রস্টেটিক হাইপারপ্লাসিয়া (Benign prostatic hyperplasia বা BPH) বহু বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে এটা দেখা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে প্রস্টেটের ক্যানসারও থাকতে পারে।

৭. কিডনির অন্যান্য অসুখ— বিভিন্ন রকম গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস (glomerulonephritis) মুলত কিডনির নানা সমস্যার কারণ।

৮. রেচনতন্ত্রের অন্যান্য অসুখ— ব্লাডারের বিলহারজিয়াসিস (Bilharziasis) — আমাদের দেশে খুব কমই দেখা যায়।

৯. রক্তের অসুখ— পারপিউরা (purpuria) সিকল্ সেল ট্রেট (sickle cell trait) এবং রক্ত তঞ্চনের সমস্যা যেমন ফন উইলিব্রেন্ট ডিজিস ইত্যাদি।

এছাড়াও যারা নিয়মিত দৌড়ন (জগিং) তাদেরও অনেক সময় হিমাচুরিয়া হতে পারে (Jogger's Haematuria)। তবে তা পরিমাণে সামান্য।

রোগীর ইতিহাস—তথ্য থেকে সত্য

হিমাচুরিয়া রোগীর ইতিহাস নেওয়ার সময় বেশ কিছু তথ্য আমাদের মাথায় রাখতে হবে যা আমাদের কারণ খুঁজতে সাহায্য করে। প্রথমত বয়স—শিশুদের ক্ষেত্রে গ্লোমেরুলোগেফ্রাইটিস, উইলমস্ টিউমার, পারপিউরা ইত্যাদি কারণ প্রধানত দেখা যায়। অন্য দিকে মাঝবয়সী মেয়েদের ক্ষেত্রে ইউ.টি.আই. (UTI) বা সংক্রমণ বেশি হয়, মাঝবয়সী ছেলেদের বেশি হয় পাথর বা সংক্রমণ, বেশি বয়স্কদের মধ্যে বিভিন্ন টিউমার বা ক্যানসারের সম্ভাবনা মাথায় রাখতেই হয়। বয়স্ক পুরুষদের আবার প্রস্টেট বাড়া একটা অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে রক্তক্ষরণ টানা হচ্ছে না কি প্রস্রাবের মাঝে মাঝে। প্রচ্ছাবের শুরুর দিকে রক্তক্ষরণ হলে সাধারণত মূত্রনালী বা মূত্রথলিজনিত কারণ থাকে আর শেষের দিকে হলে মূত্রথলির সংক্রমণ বা পাথর থাকতে পারে। অন্য দিকে প্রস্রাবের পুরো সময় জুড়ে রক্তক্ষরণ হলে কিডনি জনিত কারণ হতে পারে।

তৃতীয়ত, ব্যথা আছে কি না। ব্যথা থাকলে পাথর বা সংক্রমণ এবং না থাকলে টিউমার বা ক্যানসারের সম্ভাবনা বেশি।

শেষত, কোনো রকম চোট-আঘাত এবং কোনো ওষুধপত্র খাওয়ার কথা ভালো ভাবে জিজ্ঞাসা করতে হবে। বেশ কিছু রক্ততঞ্চন প্রতিরোধী ওষুধ আছে, সেগুলো সাধারণত হার্টের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় ও রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে।

কারণের সন্ধানে গভীরে যাও

পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু কখন করা? প্রথম কথা হল, খালিচোখে দেখা যায় এরকম যে কোনো হিমাচুরিয়া অথবা দুই থেকে তিন বার মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া হলে ডাক্তার দেখানো এবং ডাক্তারের পরামর্শমতো পরীক্ষানিরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

কী কী পরীক্ষা করা হয়

১. মূত্রের পরীক্ষা—ইউরিন রুটিন অ্যান্ড মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন (urine R/E and M/E) : এতে ধরা পড়ে প্রস্রাবের মধ্যে রক্তকণিকা এবং সংক্রমণের অন্যান্য চিহ্ন। ক্যানসার কোষও পাওয়া যেতে পারে।

২. রক্তের পরীক্ষা—কমপ্লিট হিমোগ্রাম (complete haemogram) এবং রক্ততঞ্চনের পরীক্ষা (coagulation studies)। ক্রিয়েটিনিন (creatinine) : রেচনতন্ত্রের অবস্থা বোঝার জন্য।

৩. পেটের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বা সি.টি. স্ক্যান (ultrasonography or C.T.Scan)—মূলত বৃক্ক এবং ইউরেটার দেখার জন্য, বিশেষত যেখানে কিডনির টিউমারের সম্ভাবনা থাকে

৪. ইন্ট্রাভেনাস পাইলোগ্রাম (Intravenous pyelogram–IVP)— এই পরীক্ষা সাধারণত করা হয় কিডনির পাথর দেখার জন্য।

৫. সিসটোস্কোপি (cystoscopy)—এক্ষেত্রে সিস্টোস্কোপ (cystoscope) নামক লেন্সযুক্ত নলাকৃতি যন্ত্র মুত্রনালীর ভিতর ঢুকিয়ে মূত্রনালী ও মুত্রথলি সরাসরি দেখে পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনে বায়োপ্সিও নেওয়া হয়। এই পরীক্ষা সাধারণত

প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপড়া মানে বড়ো ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা।

যদিও সবসময়েই যে রক্ত খালি চোখে দেখা যাবে তা নয়।

এই অবস্থাকে বলে 'মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া'

করা হয় মূত্রথলির টিউমার বা ক্যানসারের জন্য।

ওপরের পরীক্ষাগুলোর সবগুলো করেও যদি কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া যায় তা হলে প্রস্রাব পরীক্ষা (urine R/E, M/E and cytology) ছয় মাস, এক বছর, দুই বছর ও তিন বছরের মাথায় আবার করা উচিত।

অতঃ কিম ? প্রাথমিক চিকিৎসা

হিমাচুরিয়া রোগী কোনো ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে গেলে তার চিকিৎসা করা হয় মূলত দু'ভাবে—

১. প্রাথমিক রক্তক্ষরণের চিকিৎসা— যার মুখ্য লক্ষ্য হল সাময়িক ভাবে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা, রক্তক্ষরণ জনিত অন্যান্য নানান সমস্যা (রক্ত জমাট বেঁধে মূত্রনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য অ্যানিমিয়া ইত্যাদি)।

২. দ্বিতীয়ত, কারণের অনুসন্ধান এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা।

আসুন দেখি প্রাথমিক ভাবে কী কী করতে হবে।

- রোগীকে আশ্বস্ত করতে হবে এবং তার নাড়ির গতিও দেখতে হবে।
- প্রয়োজনে রক্তচাপ কম হলে (সাধারণত চোটআঘাত জনিত হিমাচুরিয়ায় দেখা যায়) শিরা দিয়ে স্যালাইন চালাতে হবে।
- প্রয়োজনে রক্ত দিতে হতে পারে।
- ক্যাথেটার বা প্রস্রাব নির্গমনের নল পরাতে হবে। এক্ষেত্রে মোটা (২২ বা ২৪ ইঞ্চি) থ্রিওয়ে ফলিস ক্যাথেটার পরালে ভালো হয়। তাতে ক্যাথেটার ব্লক হয়ে প্রস্রাব আটকে যাওয়া সম্ভাবনা কম। ক্যাথেটারের বেলুনে অন্তত ২০ সিসি, সম্ভব হলে ৩০ সিসি জল দিয়ে ফোলানো হয়।
- ক্যাথেটার দিয়ে ইরিগেশান অর্থাৎ টানা স্যালাইন (নর্মাল স্যালাইন বা গ্লাইসিন) চালাতে হবে। এর ফলে জমাট বাধা রক্ত ধুয়ে বেরিয়ে যায় এবং রক্তক্ষরণ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে।
- ক্যাথেটার ব্লক হয়ে এলে প্রয়োজনে ব্লাডার ওয়াশ করে ব্লক ছাড়িয়ে দিতে হয়।
- কিছু ওষুধ এক্ষেত্রে রক্ত বন্ধ করতে কার্যকরী হতে পারে যথা— ট্রেনিকসেমিক অ্যাসিড, অ্যামাইনোকোপ্রাইন অ্যাসিড ইত্যাদি। তবে ডাক্তারের অনুপস্থিতি কখনই এগুলো ব্যবহার করা উচিত নয়।
- প্রয়োজনে এবং সম্ভব হলে তৎক্ষনাৎ সিসটোস্কোপ করে রক্ত বন্ধ করা যেতে পারে।
- মূত্রনালীতে আঘাত লেগে মূত্রনালী ছিঁড়ে গেলে অনেক সময় ক্যাথেটার পরানো সম্ভব নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে সুপ্রাপিউবিক সিসটোস্টোমি (suprapubic cystostomy) অর্থাৎ পেট কেটে সরাসরি মূত্রথলিতে নল ঢুকিয়ে প্রস্রাব বার করার চেষ্টা করা যেতে পারে।
- কিডনি বা মূত্রথলিতে আঘাত লাগলে অনেক সময় অজ্ঞান করে অপারেশন করা ছাড়া উপায় থাকে না।

মূল কারণের চিকিৎসা

সাময়িকভাবে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা গেলেও মূল কারণটা খুঁজে বের করে তার চিকিৎসা না হলে পুনরায় রক্তক্ষরণ হতে পারে।

১. **সংক্রমণ :** মূলত অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন নরফ্লাক্সাসিন, সিপ্রফ্লক্সাসিন, নাইট্রোফিউরেনটয়েন) দিয়ে এর চিকিৎসা হয়। তবে জটিল সংক্রমণের ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি করে শিরা দিয়ে ওষুধ দিতে হতে পারে।

২. **পাথর :** সাধারণত ই.এস.ডাবলু.এল (E.S.W.L.) পি.সি.এন.এল. (P.C.N.L.) ইত্যাদির দ্বারা অপারেশন না করে পাথরের চিকিৎসা করা হয়।

৩. **কিডনির টিউমার :** এক্ষেত্রে কিডনি বাদ দিতে হতে পারে। এই অপারেশনও অনেকক্ষেত্রে ল্যাপ্রোস্কোপি করে করা হয়।

৪. **ব্লাডারের টিউমার :** সিসটোস্কোপি করে অপারেশন ছাড়াই এই টিউমার বাদ দেওয়া যায়। তবে ক্যানসার প্রমাণিত হলে মূত্রথলি বাদ দেওয়ার অপারেশন ছাড়া গত্যন্তর নেই।

৫. **বি.পি.এইচ. বা প্রস্টেট বাড়া :** এক্ষেত্রেও সিসটোস্কোপি করে টিউমার বাদ দেওয়া যায়। তবে ক্যানসার প্রমাণিত হলে বড়ো অপারেশন লাগতে পারে।

৬. **টি.বি., রক্তের অসুখ, কিডনির অন্যান্য অসুখ :** এগুলো সাধারণত অপারেশন ছাড়াই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

শেষ কথা যা ভুললে চলবে না

মূত্রনালী দিয়ে রক্তপাত বা হিমাচুরিয়া যত সামান্যই হোক না কেন অবহেলা করা উচিত নয়, বিশেষত বয়স্কদের ক্ষেত্রে। কারণ বয়স্কদের মধ্যে হিমাচুরিয়ার অন্যান্য কারণ হল রেচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের টিউমার। সেগুলো তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে অপারেশন বা অপারেশন ছাড়াই (সিসটোস্কোপি করে) তার নিরাময় সম্ভব। অন্যদিকে এই টিউমারই শেষের দিকে ধরা পড়লে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তারদেরও বিশেষ কিছু করার থাকে না।

লেখক পরিচিতি : ডা. সৌম্যকান্তি বাগ, এমবিবিএস, সার্জারিতে এম.এস. পাঠরত।

একক মাত্রা

গদ্য প্রবন্ধের এক আধুনিক ক্যানভাস

সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, মিডিয়া ও বিবিধ বিষয়ে এক অন্যতর গবেষণা ও আলোচনাপত্র

পাওয়া যাচ্ছে প্রায় সমস্ত স্টলে

গ্রাহক চাঁদা:১০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০ টাকা (বার্ষিক), ২০০০ টাকা (আজীবন) আজীবন গ্রাহকেরা পুরনো সংখ্যার একটি সেট বিনামূল্যে পাবেন

যোগাযোগ : ১৫০, মুক্তারাম বাবু স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৭ দূরভাষ : ৯৮৩০২৩৬০৭৬ / ৯৮৩০৪৯৩২৩৯

নবজাতকের খাদ্য খাবার

নবম পাঠ

কর্তব্যরত মায়েরা ও স্তন্যদুগ্ধের বিকল্প খাবার

স্তন্যদুগ্ধই শিশুর সেরা খাবার। কিন্তু অনেক সময় সেটা দেওয়া সম্ভব হয় না, যেমন কর্মরত মায়েদের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে সম্ভব হলে মায়েরা নিজের বুকের দুধ বের করে শিশুকে খাওয়াবেন (স্বাস্থ্যের বৃত্তে, ডিসেম্বর ২০১৪ জানুয়ারি ২০১৫ দ্রষ্টব্য), নতুবা অন্য মায়ের দুধ। সে সবের কোনোটাই সম্ভব না হলে বা শিশু কিংবা মায়ের বিশেষ রোগের জন্য স্তন্যদুগ্ধ দেওয়া অনুচিত হলে, স্তন্যদুগ্ধের বিকল্প খাবার ছাড়া গতি থাকে না— লিখছেন **ডা. স্বপন বিশ্বাস**।

কী দুধ খাওয়াবেন?

সুস্থ স্বাভাবিক শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের ইনফ্যাক্ট ফর্মুলা বা গুঁড়ো দুধ পাওয়া যায়। যেমন —

১. গোরুর দুধ (Cow's milk) : বেশির ভাগ ফর্মুলা দুধ তৈরি হয় গোরুর দুধ থেকে। এর সঙ্গে ল্যাকটোজ, ভেজিটেবল তেল, ভিটামিন, খনিজ লবণ মেশানো হয়। এই দুধে 'কেসিন' বেশি থাকে, মায়ের দুধের মতো 'হোয়ে' প্রোটিন থাকে না। মায়ের দুধের চাইতে এতে ফ্যাট কম থাকে, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে।

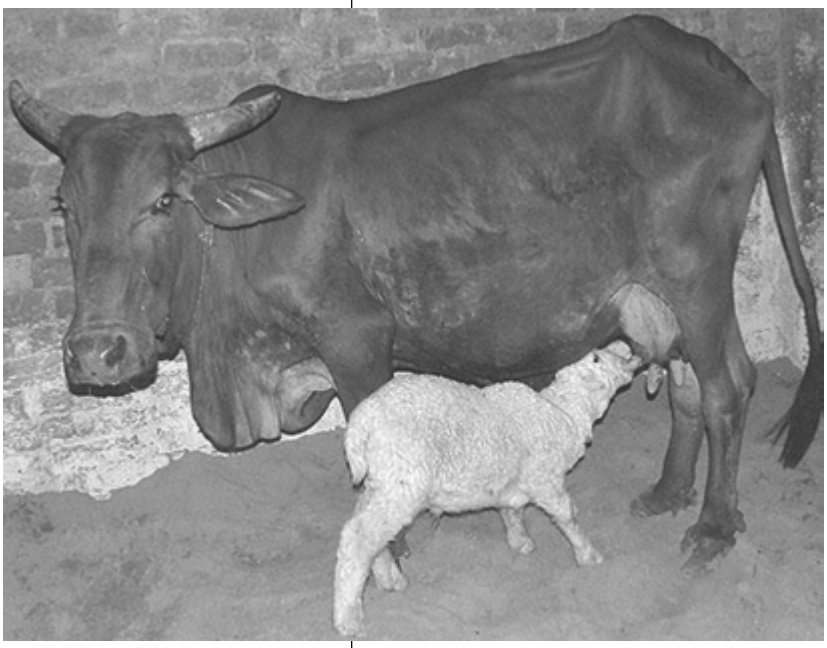

২. সয়া থেকে তৈরি, তার সঙ্গে আয়রন মিশ্রিত (Soya based with iron fortified) : এই গুঁড়ো দুধের প্রোটিন নেওয়া হয় সয়াবিন থেকে, তার সঙ্গে ভেজিটেবল অয়েল মিশিয়ে ফ্যাটের অংশ পুরণ করা হয়, আর সাধারণত সুক্রোজ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ মেশানো হয়। যে সব শিশুরা -

- গোরুর দুধের প্রোটিন হজম করতে পারে না,
- ল্যাকটেজ এনজাইমের অভাব আছে যাদের,
- যে সব শিশু গ্যালাকটোসেমিয়া রোগে ভোগে,
- যে মা-বাবারা তাদের শিশুকে সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার করাতে চান
- তাদের জন্য এই দুধ।

৩. কম অ্যালার্জির দুধ (Hypoallergic infant formula) : এই দুধের প্রোটিনকে আংশিকভাবে, প্রায় সম্পূর্ণভাবে হাইড্রোলাইজড করা হয় বা ভেঙে দেওয়া হয়; অর্থাৎ প্রোটিনকে অনেকটা পরিপাক করিয়ে দেওয়া হয়। কখনও প্রোটিনের বদলে অ্যামাইনো অ্যাসিড দেওয়া হয়। এই অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়েই প্রোটিন তৈরি হয়, ফলে শিশুকে আর প্রোটিন পরিপাক করে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে নিতে হয় না। শিশু এই ফর্মুলা সহজেই গ্রহণ করতে পারে। এতে অ্যালার্জির সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ পর্যন্ত কমে।

৪. ল্যাকটোজ-ফ্রি ফর্মুলা (Lactose-free formula) : গরুর দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকে। একে পরিপাক করতে গেলে শিশুর অন্ত্রে ল্যাকটোজ নামক উৎসেচকের প্রয়োজন। কিন্তু নবজাতকের এবং আগে জন্মানো শিশুর অথবা কারও ক্ষেত্রে বংশগত ভাবেই এই ল্যাকটেজ উৎসেচক থাকে না। তখন সেই শিশু ল্যাকটোজ পরিপাক করতে পারে না, তার পুষ্টি হয় না, নানা রকম পেটের অসুখে, যেমন গ্যাস, পেটে ব্যথা, পাতলা পায়খানা ইত্যাদিতে ভোগে। সয়া থেকে তৈরি ফর্মূলায় ল্যাকটোজ থাকে না, ফলে এইসব সমস্যা হয় না।

৫. দীর্ঘ শৃঙ্খল যুক্ত একাধিক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য যুক্ত ফর্মূলা (Poly unsaturated fatty acid and other fortified formula) : সম্প্রতি শিশুর শরীর গঠনের প্রয়োজনীয় নানা ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোবায়োটিক, প্রিবায়োটিক (যা পেটের অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটিরিয়ার সংখ্যা বাড়ায়) বা নিউক্লিওটাইড মিশ্রিত ফর্মূলা বের করা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ শিশুর ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা আছে।

বিভিন্ন সম্পূরক খাদ্য সম্পর্কে কিছু জানার কথা

- **গোরুর দুধ** (Whole cow milk) : অপরিবর্তিত গোরুর দুধ শিশুকে ১ বছর বয়সের আগে দিতে নেই। কারণ—
- এতে প্রোটিন, শর্করা বা অন্য খাবার শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী যথাযথ থাকে না
- অপরিণত অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে, যা খালি চোখে দেখা যায় না। এর ফলে শিশু রক্তাল্পতায় ভুগতে পারে
- শিশুর কিডনিতে চাপ পড়ে
- গোরুর দুধের প্রোটিনে অ্যালার্জি হতে পারে।

১২ মাস বয়সের পরে শিশুর অন্ত্রের পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে এ সব উপসর্গ কমে যায়।

- **কম ফ্যাটের স্কিমড বা সেমি স্কিমড গরুর দুধ** : এতে ফ্যাট, ভিটামিন, ক্যালোরি ও পুষ্টিগুণ কম থাকে, তাই এই দুধ শিশুকে খাওয়াতে নেই।

- **ছাগলের দুধ** (Goat's milk) :

শিশুকে খাওয়ানো উচিত নয়, কারণ ছাগলের দুধে আয়রন, ভিটামিন-সি, ডি, থিয়ামিন, নিয়াসিন, বি-৬, ও প্যানটোথেনিক অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে। গোরুর দুধের মতো এই দুধ ও কিডনির উপর চাপ বাড়ায়, এছাড়া নবজাতকের পক্ষে মারাত্মক 'মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস' ও হতে পারে। তবে ছাগলের দুধে প্রয়োজনীয় উপাদান মিশিয়ে তৈরি করলে সেই দুধ খাওয়ানো যায়।

শিশুকে অন্য কোনো মিষ্টি পানীয়, কনডেনসড মিল্ক বা গাঢ় দুধ দিতে নেই।

এবার আসুন, দেখে নিই যদি মায়ের দুধের পরিবর্তে (সম্পূরক) বা মায়ের দুধের সঙ্গে (পরিপূরক), অন্য দুধ দিতেই হয় তবে সেটা কী ভাবে শিশুর জন্য নিরাপদ করে বানানো যায়।

কী করে দুধ তৈরি করতে হবে

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা (WHO guideline)

খাবারের সরঞ্জাম পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা : প্রথমে দুধ তৈরির সরঞ্জাম, যেমন দুধের বোতল, বোতলের নিপল ও নিপলের ঢাকনা, পরিষ্কার করার ব্রাশ পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

পরিষ্কার করা :

- আগে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুয়ে হাত পরিষ্কার কাপড়ে মুছে নিতে হবে।
- তারপর ঠান্ডা কলের জলে শিশুর খাবারের পর পরই বোতল, নিপল ধুয়ে নিতে হবে।
- তারপর গরম জলে ডিটারজেন্ট মিশিয়ে বোতল, নিপল ও ঢাকনা ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করতে হবে। দরকারে ব্রাশ দিয়ে ঘসে নিতে হবে। দেখতে হবে, নিপলের মুখ খোলা আছে কি না। নিপল উলটে দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- বাকি জল ঢেলে ফেলে দিতে হবে। তারপর আবার পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। ডিটারজেন্ট যেন না থাকে।

জীবাণুমুক্ত করা :

শিশুর খাবারের সব সরঞ্জাম জীবাণুমুক্ত করতে হবে

তিন ভাবে জীবাণু মুক্ত করা যায় :

১. ফোটানো জল :

- একটা বড় পাত্রে পরিষ্কার জল নিতে হবে।
- এবার পরিষ্কার করা বোতল, নিপল, ঢাকনা ইত্যাদি শিশুর খাবারের সব সরঞ্জাম তার মধ্যে রাখতে হবে। সব কিছু যেন জলের মধ্যে ডুবে থাকে।
- পাত্রটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- এবার কমপক্ষে ৫ মিনিট ধরে জল ফোটাতে হবে।
- ঢাকনা সহ পাত্র ওই অবস্থায় রেখে দিতে হবে যতক্ষণ না ঠান্ডা হয়।
- জল ঝেড়ে ফেলে সব কিছু শুকনো ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। ভালো হয় কোনো ঢাকনা যুক্ত প্লাস্টিকের পাত্রে রাখলে।
- যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করা না হয়, তবে আবার সব কিছু জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

২. স্টিমের সাহায্যে :

- ইলেকট্রিক বা মাইক্রো ওয়েভ স্টেরিলাইজার পাওয়া যায়, সেখানে নির্দেশ দেওয়া থাকে। সেই ভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায়।

৩. রাসায়নিকের সাহায্যে :

- একটা বড় কাঁচের বা প্লাস্টিকের পাত্রে নির্দেশ মতো জল নিয়ে রাসায়নিক মিশিয়ে নিতে হবে।
- বোতল, নিপল ও অন্য সরঞ্জাম পাত্রের মধ্যে রাসায়নিকযুক্ত জলের মধ্যে ডুবিয়ে ঢেকে রাখতে হবে (নির্দেশ মতো)। কোনও ধাতব পদার্থ রাখা যাবে না।

যে ভাবেই জীবাণুমুক্ত করা হোক না কেন, জীবাণুমুক্ত সরঞ্জাম কোনও জীবাণুমুক্ত ফরসেপস বা সাঁড়াশি জাতীয় কিছু দিয়ে ধরে তুলতে হবে।

কী ভাবে দুধ তৈরি করবেন?

১. একটা কেটলিতে অনুমোদিত পরিষ্কার ও পরিশ্রুত জল নিতে হবে।
২. এবার জল টগবগ করে ১-২ মিনিট ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। ৫ মিনিটের বেশি ফোটালে জলে লেড (Lead) ও নাইট্রেটের (Nitrate) ঘনত্ব বেড়ে যায়। তারপর ফোটানো জল ঢেকে রাখতে হবে।
৩. যে গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো হবে, সেই দুধের কৌটার গায়ে লেখা নির্দেশ ভালো করে আগে পড়ে নিতে হবে।
৪. এবার ফোটানো জলের তাপমাত্রা যখন ৭০ সেন্টিগ্রেডে আসবে, (মোটামুটি ৩০ মিনিট পরে) তখন আগে থেকে পরিষ্কার করা ও জীবাণুমুক্ত বোতলে পরিমাণ মতো জল ঢেলে নিতে হবে।
৫. জলের পরিমাণ অনুযায়ী পরিমাণ মতো, নির্দেশ মতো, গুঁড়ো দুধ মেশাতে হবে। সাধারণত কৌটার মধ্যেই চামচ দেওয়া থাকে। এক পূর্ণ চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ ১ আউন্স (৩০ মিলিলিটার) জলে মেশাতে হয়।
৬. বোতলের মুখ আটকে, ভালো করে ঝাঁকিয়ে দুধ গুলে নিতে হবে।
৭. এবার ঠান্ডা জলে বোতল রেখে দুধ ঠান্ডা রাখতে হবে।
৮. বোতলের বাইরেটা ভালো করে তোয়ালে দিয়ে মুছে নিয়ে শিশুকে খাওয়ানো যাবে। তবে খাওয়ানোর আগে দুধ ঠিকমতো ঠান্ডা হয়েছে কি না দেখা দরকার।
৯. বোতল থেকে এক ফোঁটা দুধ হাতের কব্জির ওপর ফেলে দুধের তাপমাত্রা অনুমান করতে পারা যায়। সে ভাবে দুধের তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে।
১০. এবার শিশুকে খাওয়ানো শুরু করা যাবে। খাওয়ানোর পরে অতিরিক্ত কোনো দুধ ২ ঘণ্টার বেশি রাখা যাবে না।

কী ভাবে শিশুকে খাওয়াবেন?

১. আগে দেখে নিন দুধের তাপমাত্রা ঠিক আছে কি না।
২. শিশুর মাথা সামান্য উঁচু করে ধরুন।
৩. বোতল কাত করে ধরে নিপল হাল্কা করে মুখে ছোঁয়ালে শিশু সহজেই মুখের মধ্যে নিয়ে নেবে।
৪. এমন ভাবে ধরতে হবে, যেন দুধে নিপল পরিপূর্ণ থাকে, তা না হলে হাওয়া ঢুকে যাবে।
৫. শিশুর পেট ভরে গেলে সে বোতল আর টানবে না। তখন খাওয়া শেষ হলে বোতল সরিয়ে নিতে হবে।
৬. শিশুর খাওয়া হলে কোলে বসিয়ে বা কাঁধের ওপর নিয়ে পিঠ হালকা ভাবে চাপড়ে হাওয়া বের করার চেষ্টা করতে হবে। একে বলে Burping। খাওয়ানোর পরে ১০-১৫ মিনিট শিশুকে খাড়া করে রাখতে হয়, তা হলে শিশু আর দুধ বের করে দেয় না।
৭. শিশুকে অতিরিক্ত কোনও জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না, তবে মাঝে মাঝে অল্প জীবাণুমুক্ত জল দেওয়া যেতে পারে।

শিশুকে কতটা দুধ খাওয়াতে হবে?

বয়স ও ওজন অনুযায়ী শিশুকে দুধ খাওয়াতে হবে। শিশুর দুধের পরিমাণ নির্ভর করবে তার ওজনের ওপর।

- প্রথম দিনে শিশুর দুধ লাগে ৬-১২ মিলিলিটার প্রতি কেজি ওজনের জন্য
- দ্বিতীয় দিনে শিশুর দুধ লাগে ২৫ মিলিলিটার প্রতি কেজি ওজনের জন্য
- তৃতীয় দিনে শিশুর দুধ লাগে ৬৬ মিলিলিটার প্রতি কেজি ওজনের জন্য
- চতুর্থ দিনে শিশুর দুধ লাগে ১০৬ মিলিলিটার প্রতি কেজি ওজনের জন্য

বয়স	২৪ ঘণ্টায় কতবার খাওয়াতে হবে	খাবারের মোট পরিমাণ
০-৩ মাস	৬-৮ বার	১৫০ মিলিলিটার প্রতি কেজি হিসাবে
৪-৬ মাস	৪-৬ বার	১৫০ মিলিলিটার প্রতি কেজি হিসাবে
৭-৯ মাস	৪-৫ বার	১২০ মিলিলিটার প্রতি কেজি হিসাবে
১০-১২ মাস	৩-৪ বার	১২০ মিলিলিটার প্রতি কেজি হিসাবে

তৈরি করা দুধের সংরক্ষণ

১. মনে রাখতে হবে গুঁড়ো দুধ জীবাণুমুক্ত নয়। তাই তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গেই দুধ খাওয়াতে হবে। দরকার হলে আবার তৈরি করতে হবে।

২. স্বাভাবিক তাপমাত্রায় দুধ তৈরি করার পরে ২ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা যায়।
৩. কোনো কারণে আগে খাবার তৈরি করতে হলে তৈরির পর পরই ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কম তাপমাত্রায় ফ্রিজে রাখলে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত রাখা যায়।
৪. ফ্রিজ থেকে বের করে উষ্ণ জলে ১৫ মিনিট রেখে ২ ঘণ্টার মধ্যে খাওয়াতে হবে। অতিরিক্ত দুধ আর সংরক্ষণ করা যাবে না।
৫. বেড়াতে গেলে আগে দুধ তৈরি করে নেওয়া যায়। দুধ তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে তারপর সেই দুধকে আইসব্যাগে করে নিলে দুধ ঠিক থাকে। তবে ২ ঘণ্টার বেশি সময়ের জন্য হলে গরম জল ও গুঁড়ো দুধ আলাদা করে নিয়ে দুধ তৈরি করে খাওয়ানো উচিত।
৬. ফোটানো জল না পাওয়া গেলে পরিষ্কার পরিশ্রুত জলেও দুধ গোলা যাবে। তবে সেই দুধ শিশুকে তখনই খাওয়াতে হবে এবং রাখা যাবে না।

প্রসঙ্গত : দুধ নিয়ে দু'চার কথা

আমাদের আলোচনা প্রসঙ্গে এসেছে গুঁড়ো দুধের কথা। এছাড়াও মায়েরা বিভিন্ন সময়ে গোরুর, মোষের বা ছাগলের দুধ নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করেন। আবার মাদার ডেয়ারি বা অন্য ডেয়ারিও নানা রকমের দুধ বাজারে ছাড়ে। তার কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা খাব, কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ তাই নিয়ে আমরাও ধন্দে থাকি। তাই দুধ নিয়ে দু'চার কথা বলা দরকার।

সাধারণত প্যাকেটের বা গুঁড়ো দুধ বলতে আমরা গোরুর দুধকেই বুঝি। কী ভাবে সেই দুধ তৈরি করা হচ্ছে এবং সেই দুধে ফ্যাটের পরিমাণ কত, তাই দিয়েই দুধের গুণাগুণ বিচার এবং শ্রেণি-বিভাগ করা হয়। প্যাকেটের দুধও বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

১. **হোল মিল্ক** (whole milk) :

- স্বাভাবিক হোল মিল্ক : এই দুধ থেকে কিছু বের করে নেওয়া হয় না, কিছু যোগও করা হয় না। স্বাভাবিক গোরুর দুধে যে সব পুষ্টিগুণ থাকে, এতে তাই থাকে।
- হোল স্ট্যান্ডার্ডাইজড দুধ : এই দুধে ফ্যাটের পরিমাণ থাকে কম পক্ষে ৩.৫ শতাংশ।
- হোল হোমোজিনাইজড দুধ : এই দুধের পুষ্টিগুণ স্বাভাবিক হোল মিল্কের মতো, কিন্তু এর ফ্যাটের বড়ো বড়ো দানাগুলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভেঙে ছোটো করে দুধে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তাই দুধের ওপর কোনো সর ভাসে না।

২. **সেমি স্কিমড দুধ** (Semi-skimmed milk) : স্বাভাবিক হোল মিল্কের ফ্যাটের পরিমাপ কমিয়ে এই দুধে ১.৭ শতাংশ করা হয়। এই দুধই বেশি প্রচলিত।

৩. **স্কিমড দুধ** (Skimmed milk) : স্বাভাবিক হোল মিল্কের ফ্যাট প্রায় সম্পূর্ণটা তুলে এই দুধ তৈরি করা হয়। এই দুধে ফ্যাটের পরিমাণ থেকে ০-০.৫ শতাংশ, গড়ে ০.১ শতাংশ। এই দুধ পাতলা হয়, ক্যালরি কম থাকে, ভিটামিন কম থাকে, স্বাদ কম হয়। ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এই দুধ খাওয়ানো উচিত নয়।

৪. ১ শতাংশ ফ্যাটের দুধ (1% Fat milk) : এই দুধে ফ্যাটের পরিমাণ ১ শতাংশ।

৫. অরগানিক দুধ (organic milk) : এই দুধ যে সব গোরু থেকে উৎপাদন করা হয়, তাদের এমন ঘাস বা খাবার দেওয়া হয়, যেখানে কোনো রাসায়নিক সার বা রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। বাস্তবে এদেশে এটা কতটা সম্ভব হয়, তা ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

৬. জার্সি গোরুর দুধ (Jersey milk) : এই দুধে ফ্যাটের ও ক্যালরির পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বেশি, তাই এতে সর বা ক্রিম বেশি হয়।

৭. গন্ধযুক্ত দুধ (Flavoured milk) : ১ শতাংশ ফ্যাট দুধ বা যে কোনো দুধে নানা ধরনের ফ্লেভার বা গন্ধ মিশিয়ে এই দুধ তৈরি করা হয়। যেমন— চকোলেট, আনারস, আমের গন্ধ।

৮. পাস্তুরাইজড দুধ (Pasteurised milk) : পাস্তুরাইজ পদ্ধতির মাধ্যমে এই দুধ জীবাণুমুক্ত করা হয়। কোনো দুধকে ৭২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২৫ সেকেন্ড ধরে উত্তপ্ত করে খুব তাড়াতাড়ি তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রিতে নামিয়ে এনে পাস্তুরাইজড করা হয়।

৯. আল্ট্রা হিট দুধ (UHT milk) : এই দুধকে কমপক্ষে ১৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জীবাণু মুক্ত করা হয়। এই দুধ বেশি দিন রাখা যায়।

১০. কনডেনসড মিল্ক (Condensed milk) : দুধের জল কমিয়ে গাঢ় করে তার সঙ্গে সুগার বা চিনি মিশিয়ে এই দুধ তৈরি করা হয়।

১১. গুঁড়ো দুধ (Dried milk powder) : দুধের সমস্ত জলকে শুকিয়ে নিয়ে তার থেকে গুঁড়ো দুধ তৈরি করা হয়। প্রথমে দুধ হোমোজিনাইজড করা হয়, তারপর সেই দুধ থেকে দুই ভাবে গুঁড়ো তৈরি করা হয়।

ক. স্প্রে করে : গাঢ় দুধকে স্প্রে করে একটা গরম হাওয়া বাহিত চেম্বারের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে গরম হাওয়ায় দুধের বাকি জল শুকিয়ে যায় এবং দুধ গুঁড়ো হয়ে চেম্বারের মেঝেতে জমা হয়। সেই গুঁড়ো সংগ্রহ করে গুঁড়ো দুধ তৈরি করা হয়।

খ. রোলারের মাধ্যমে শুকিয়ে : গাঢ় দুধকে একটা গরম রোলারের ওপর দিয়ে চালনা করা হয়। দুধ শুকিয়ে গুঁড়ো রোলারের গায়ে জমা হয়। সেই গুঁড়ো রোলার থেকে বের করে গুঁড়ো দুধ তৈরি করা হয়।

হোল মিল্ক থেকে তৈরি করা গুঁড়ো দুধে ভিটামিন-সি, থিয়ামিন, ভিটামিন-বি ১২ ছাড়া সমস্ত রকমের পুষ্টিগুণ থাকে। স্কিমড মিল্ক থেকে তৈরি করা গুঁড়ো দুধে প্রায় কোনো ফ্যাট থাকে না, তাই সেখানে কোনো ফ্যাটে দ্রবণীয় ভিটামিনও থাকে না। তবে গুঁড়ো দুধে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন-বি২ এসবের পরিমাণ ঠিক থাকে।

লেখক পরিচিতি : ডা. স্বপন বিশ্বাস, ডিসিএইচ, এমডি, শিশু বিশেষজ্ঞ একটা সরকারি হাসপাতালে কর্মরত

এক গ্রামের ডাক্তারের গল্প

অষ্টম পর্ব

এদেশের গ্রামে চিকিৎসা-পরিষেবার হাল খুব খারাপ। সরকারি যে সব স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর গ্রামীণ হাসপাতাল আছে সেখানে ওষুধ যন্ত্রপাতি প্রায় কিছুই নেই, আছে শুধু জঞ্জালের স্তূপ। শহরের মাঝখানে মেডিক্যাল কলেজে বসে ৫-১০ বছর পড়াশুনো করে যখন নতুন ডাক্তারেরা গ্রামের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান তখন অনেকেই পালানোর পথ পান না। তবে সকলেই তো পালানোর লোক নন, তাঁরা শেষ অবধি না দেখে ছাড়েন না— সেই দেখার আর বাঁচার সত্যি কাহিনি শোনাচ্ছেন **ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত**।

আগে যা জেনেছি

এই সংখ্যায় 'এক গ্রামের ডাক্তারের গল্প'র অষ্টম কিস্তি। প্রথম সাত কিস্তিতে আমরা শুনেছি 'কলকাতার ছেলে' অনিরুদ্ধ মেডিক্যাল কলেজে বছর আষ্টেক ধরে পড়াশুনো আর শিক্ষানবিশি করার পর দিল্লিতে বড়ো হাসপাতালের আরামের চাকরি ছেড়ে হঠাৎ করেই ১৯৯০ সালে রাজ্য সরকারের চাকরি নিয়ে কলকাতা থেকে দূরে, ডায়মন্ড হারবারের কাছাকাছি পাণ্ডববর্জিত পাড়া-গাঁ বেলপুকুরে গেড়ে বসলেন।

ডাক্তারের কোয়ার্টার ভাঙাচোরা, সাপের আড্ডা, ছোটো কোয়ার্টারে থাকার ব্যবস্থা করলেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পাশেই ইলেকট্রিক ট্রান্সফর্মার আছে সুতরাং প্রায় গায়ের জোরেই সেখান থেকে লাইন টেনে হাসপাতালে ইলেকট্রিক কানেকশন আনলেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় ওষুধ-বিষুধ আনতে গিয়ে জেলার প্রধান মেডিক্যাল অফিসবাবুরা প্রায় সব ওষুধ 'সাপ্লাই নেই' লিখে দিলেন।

এই সবের মধ্যেও রোগী দেখা আর রোগ সারানোর ফলে মানুষজন ডাক্তারকে ভালোবেসে ফেললেন। ডাক্তার যেটুকু সামান্য যন্ত্র আর সুবিধা পেলেন তা কাজে লাগিয়ে, গতানুগতিক নিয়ম ভেঙে, কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে মাথায় রেখে, সার্জারি করতে লাগলেন, আর রোগীকে বাঁচানো গেল। শুরুতে ছিল খালি বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশন—রোগী ভোগে বীজাণু সংক্রমণে। অনিরুদ্ধ ও তাঁর ডাক্তার স্ত্রী কনীনিকা সংক্রমণ রুখতে উপযোগী ব্যবস্থা কার্যকর করলেন। অন্য হাসপাতাল ফেরত অপারেশনের রোগী প্রথমে বাধ্য হয়ে, তারপর ডাক্তারের ওপর প্রায় গায়ের জোর খাটিয়ে, বেলপুকুরে বেশ বড়ো অপারেশন করিয়ে ছাড়ল, অনেকের প্রাণ বেঁচে গেল। হাসপাতাল-কর্মী আর গ্রামের মানুষ জেনারেটর ভাড়া করে, কেরোসিনের ব্যবস্থা করে, অপারেশন চালু রাখলেন— নিজের উৎসাহে কঠিন কাজ শিখে নিলেন, সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে 'বড়ো' অপারেশন করা হল। বেলপুকুর হাসপাতালে একটা ভাঙাচোরা প্রসব ঘরে অপারেশন করতে হত— কিন্তু বীজাণু-সংক্রমণের হার মেডিক্যাল কলেজের চাইতে কম ছিল। অনিরুদ্ধ দেখলেন বিলেতের রুরাল সার্জারি আর ডে-কেয়ার সার্জারি তাঁর কাজের সঙ্গে একই মূলমন্ত্রে গাঁথা।

অনিরুদ্ধর সার্জারি টিম জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করে পথ দুর্ঘটনায় আহত মানুষদের বাঁচানো সম্ভব হয়। একটা ছেলের প্রস্রাবের নলের ভিতরকার অংশটা দুর্ঘটনায় ছিঁড়ে গেলে অনিরুদ্ধ বাধ্য হয়েই জটিল 'ইউরেথ্রোপ্লাস্টি' অপারেশন করলেন।

আর এইসব কাজের অভাবিত ফল ফলল। গভীর রাত্রের বাসে অনিরুদ্ধর ঘড়ি নিয়ে নিল ডাকাত, ক'দিন পরে সেই ডাকাতের বাবা অনিরুদ্ধর বাসায় এসে ক্ষমা চেয়ে নিজের কেনা একটা ঘড়ি দিতে এলেন। হাসপাতালের মধ্যে খানাখন্দ বোঝাই একটা মাঠে ফুটবল খেলতেন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী আর গ্রামবাসীরা। হাসপাতালের পাশে রেললাইন তৈরি হচ্ছিল, এক রাতে সে কাজের এক কর্মীর স্ত্রীর অন্ত্রনালী ফুটো হয়ে 'পেরিটোনাইটিস' হয়ে গেল, ঠিকাদারবাবু মহকুমা হাসপাতালে যেতে রাজি নন। অগত্যা অপারেশন হল, রোগী ভালো হয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে ঠিকাদারবাবু হাসপাতালের জন্যে কিছু করে দিতে চেয়ে হাসপাতালের চাষের জমিটা মাটি ফেলে ভরাট করে ফুটবল মাঠ করিয়ে দিলেন।

কাকদ্বীপ হাসপাতাল থেকে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা রোগীকে নিয়ে এক অটোরিক্সা রোগীর অবস্থা সঙ্গীন দেখে রাস্তায় বেলপুকুর হাসপাতালে ঢুকে পড়লেন। ডাক্তার সন্দেহ করলেন রাপচারড অ্যাক্টোপিক প্রেগন্যান্সি। রোগীর লোকজন ডায়মণ্ডহারবার হাসপাতালে যাবে না। অপারেশন করে সেই অ্যাক্টোপিক প্রেগন্যান্সির রোগীকে বাঁচানো গেল।

কিন্তু ডাক্তারের ভুলও হয়েছে। এক দিন দূরের এক গ্রাম থেকে এক অন্তঃসত্ত্বা এলেন, ডাক্তার ভাবলেন স্বাভাবিক প্রসব হবে। কিন্তু প্রসব এগোয় না; কুলপি হাসপাতালে রেফার করতে দেরি হয়ে গেল; শেষে রেফার করলেন। বাচ্চাটাকে বাঁচানো গেল না, আগে এনে সিজার করলে ঠিক হত। এরপর অনিরুদ্ধ কুলপি হাসপাতালে দু'জন দক্ষ নার্সের কাছে প্রসব করানোর প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করলেন। এরকম ভুল আর হয়নি।

বেলপুকুরে বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন সার্জিক্যাল টিম গড়ে তোলা হল। পেশাগত পড়াশোনার সরকারি যোগ্যতামান এই টিমের সদস্যদের ছিল না। পুঁথিপড়া যোগ্যতার চাইতে কাজের চেষ্টা, ইচ্ছে, আর রোগীদের প্রতি ভালোবাসা বেশি দামি, তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। অপারেশন থিয়েটারে চটি আর আলোর ব্যবস্থাও করতে হয় নিজেদের। এই অপারেশন থিয়েটারে এই সার্জিক্যাল টিমের সাহায্যেই অনিরুদ্ধ লিভারে হাইটাটিড সিস্ট বাদ দেওয়ার অনেকগুলো সফল অপারেশন করতে পারেন; অথচ মেডিক্যাল কলেজেও এই অপারেশনে অধিকাংশ রোগী বাঁচেন না। এছাড়া 'পেডিকেল গ্রাফট' ব্যবহার করে প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে একজন মানুষের ডান হাত বাঁচালেন অনিরুদ্ধ।

পরপর সাতটা পর্ব লেখার পরে বোধহয় এক বছর পরে *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকায় আবার লিখছি, আজ অষ্টম পর্ব। অজুহাত দেওয়ার মানে হয় না, তবু বলার কথা এইটাই যে লেখাটা আমার বড় একটা আসে না। বেলপুকুরে কাজ যখন করতাম তখন সব সময় ঘোর বর্তমানে থাকতাম, সেটা যে এক দিন অতীত হবে, তাই নিয়ে আবার লিখব এই ভাবে, এটা ভাবিনি। তবে লিখে মনে হচ্ছে, কথাগুলো জমে ছিল আমার মধ্যে, বলে খানিক আনন্দ পাওয়া গেল। আমার সে সময়কার কাজের কথাই বললাম, আজকেও তাই বলব, তবে আজ বলার পর ছুটি। শেষে শুধু বলব বেলপুকুর থেকে আমি কী কী শিখলাম। আসুন শুরু করি।

প্রস্টেট অপারেশন, স্পাইনাল অ্যানাস্থেশিয়া

বীরেন্দ্র মণ্ডলের বয়স ৮৫, কিন্তু এখনও নিয়মিত চাষ-বাস অথবা মাছের আড়তের দেখাশোনা করেন। কয়েকদিন ধরে অবশ্য একটা ছোটো সমস্যা অসুবিধা করছিল। রাত্রে বারে বারে প্রস্রাব করতে উঠতে হচ্ছিল, সামান্য বেগ এলেও সামলানো মুশ্‌কিল হচ্ছিল, আর প্রস্রাব করেও যেন তলপেট পুরো খালি হচ্ছিল না। শরীর ঠান্ডা করা, ডিম-আমিষ খাওয়া বন্ধ করেও কোনো লাভ হল না বরং বেড়েই যাচ্ছিল উপসর্গগুলো। কলকাতার নামজাদা স্পেশালিস্ট ডাক্তার রবিবার করে কাকদ্বীপে রোগী দেখতে আসেন— ছেলেরা সেখানে নাম লেখাল। কিন্তু বীরেনবাবু ফি শুনে আঁতকে উঠলেন— পাঁচ মিনিটের জন্য ৪০০ টাকা! চলে গেলেন ৫ নং হাটের কাছে একজন হোমিওপ্যাথের কাছে। এলাকায় খুব সুনাম। দেখে তিনি পরামর্শ দিলেন, ''আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই। বরং বেলপুকুর হাসপাতালের ডাক্তারকে দেখান। প্রাইভেট দেখেন না, কিন্তু যত্ন নিয়ে দেখেন। একটু মেজাজ গরম, তাই দেরি হলেও ধৈর্য রাখবেন।''

আড়তের মাছের গাড়ির ড্রাইভারের হাত দিয়ে নাম-ঠিকানা লিখে পরের দিনই পাঠিয়ে দিলেন বীরেনবাবু। বকখালি থেকে প্রায় ৫০ কিমি দূরে, মাঝখানে আবার নদী পার হতে হয়। প্রথম ফেরি ধরলেও পৌঁছোতেই সকাল ১০টা বাজবে। তারপরে OPD টিকিট করলে বিকেলের আগে দেখানো হবে না। যাই হোক, ড্রাইভারকে দিয়ে টিকিট করানোর ফলে দুপুরের মধ্যেই দেখানো হয়ে গেল— শুইয়ে পেট টিপে, ঠুকে, এমনকী, পায়ুর মধ্যে আঙুল ঢুকিয়েও ডাক্তার দেখল। বলল, প্রস্টেস্ট বেড়েছে, অপারেশন করতে হবে, ওষুধ দিয়ে কোনো লাভ নেই। অবশ্য এক্ষুণি না করলেও চলবে। বলা বাহুল্য, এ ডাক্তার হল এই অধম। আমি আরও বললাম, একটু সাবধানে থাকতে হবে— ঠান্ডা লাগানো যাবে না, অনেকক্ষণ প্রস্রাব চাপা যাবে না। না হলে প্রস্রাব আটকে যেতে পারে, রক্তক্ষরণ হতে পারে ইত্যাদি।

বিনা পয়সার ওষুধ-বিহীন চিকিৎসা ছেলেদের মোটেই পছন্দ হল না। মহকুমার সবচেয়ে নামজাদা সার্জনকে দেখানোর জন্য বাবাকে নিয়ে গেলেন তাঁরা। তিনি দেখে বললেন— কালকেই কলকাতা চলে যান। আমি ডাক্তারের নামে চিঠি লিখে দিচ্ছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করিয়ে নিন। বীরেনবাবু বাড়ি ফিরে গেলেন। মাস কয়েক বাদে ডিসেম্বরের ঠান্ডার মধ্যে মাছের আড়তের ঝামেলা সামলে বাড়ি ফিরতে দেরি হল। ভোর থেকে পেটে যন্ত্রণা— প্রস্রাব পাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না। কাকদ্বীপ হাসপাতালে ডাক্তার প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে নল (ক্যাথেটার) পরানোর করার চেষ্টা করে বিফল হয়ে মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে দিল। মহকুমা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে আবার ক্যাথেটার করার চেষ্টা সফল হল না। ততক্ষণে বীরেনবাবুর মূত্রথলি (urinary bladder) নাভি পর্যন্ত ফুলে গিয়েছে। কষ্ট লাঘব করার জন্য একটা লম্বা ছুঁচ দিয়ে পেট দিয়ে অনেকটা পেচ্ছাপ বার করে দিতে কিছুটা কষ্ট কমল, কিন্তু আবার রেফার কলকাতায়। মহকুমা হাসপাতালে এত বড়ো অপারেশন করা সম্ভব নয়— এমনকী, নার্সিংহোমেও না। আসার পথে চোখে পড়েছিল বেলপুকুর হাসপাতালে রোগীর বুধবারের ভীড়। আজ অনেক রাত পর্যন্ত ডাক্তারবাবু হাসপাতালেই থাকবেন কারণ বৃহস্পতিবারের অপারেশনের প্রস্তুতি চলবে।

এই ভাবে বীরেনবাবু রাত্রি ৮টার সময় আমার কাছে পৌঁছোলেন। তিনি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করলেও আমি ধীরেসুস্থে আবার ক্যাথেটার করার চেষ্টাই করলাম— সফলও হলাম।

বীরেনবাবুর শান্তি, ছেলেরাও এবার ভরসা পেল যে আমি নামজাদা পসারওয়ালা বড়ো ফি নেওয়া ডাক্তার না হলেও কিছুটা দক্ষতা হয়তো আমার আছে। যথারীতি আর্জি পেশ হল— বীরেনবাবুর অপারেশনটা আমাকেই করতে হবে। নতুন অপারেশন দেখার উৎসাহে তাতে গলা মেলালো নাসির, সুলেমান, আশিস, বাসু ইত্যাদি— আমার বেলপুকুর হাসপাতালে 'ফুল টিম'। আমারও যে ইচ্ছা ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমস্যা একটাই, সুষুম্নাকাণ্ডে ইঞ্জেকশন করে অজ্ঞান (spinal anaesthesia) করতে হবে। এই অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়ার পদ্ধতিটা আশিসের আয়ত্তের বাইরে, এমনকী, আমারও। তাই না বলে দিলাম। কিন্তু মনে করিয়ে দিলাম যে প্রতি মাসেই ক্যাথেটার পালটাতে আসতে হবে। মাস দুয়েক ধরে বীরেনবাবু বেলপুকুর হাসপাতালে হাজিরা দেওয়ার পরে আমি অপারেশন করতে রাজি হলাম, কারণ এই দুই মাস আমিও মেডিকেল কলেজে হাজিরা দিচ্ছিলাম আর ওখানকার অ্যানাস্থেটিস্ট উৎপলদার কাছে গিয়ে স্পাইনাল অ্যানাস্থেশিয়া দেওয়ার তালিম নিচ্ছিলাম। এক্সপার্ট না হলেও, মোটামুটি কাজ চালানোর মতন শিখে নিয়েছিলাম ব্যাপারটা। কয়েকটা হার্নিয়া আর নিম্নাঙ্গের অপারেশন করে নিয়েছিলাম এই পদ্ধতিতে অবশ করে। তাই আত্মবিশ্বাসও বেড়ে গিয়েছিল।

অপারেশনের দিন নাসিরদের উৎসাহের কোনো শেষ নেই। আমার চিন্তা—স্পাইনাল ঠিক দিতে পারব তো? কনীনিকার চিন্তার কারণ হল ও আগে কোনওদিনই প্রস্টেট অপারেশন দেখেনি।

ভাগ্যক্রমে সব কেমন জানি সহজেই হয়ে গেল। আমি নিজেই স্পাইনাল অ্যানাস্থেশিয়া দিয়ে তারপরে অপারেশন করলাম— কোনো গন্ডগোল হল না। বাসু চায়ের দোকানে গিয়ে বলল— এবার বেলপুকুর হাসপাতালটাকেই মহকুমা হাসপাতাল করে দিলে পারে। সুলেমান মাঝে মাঝেই আমার জন্য চা আর সিগারেট নিয়ে আসতে লাগল। কনীনিকা চট করে একটা র‍্যানিটিডিন ট্যাবলেট খেয়ে নিল— ওরই সবচেয়ে টেনশন হয়েছিল।

বীরেনবাবুর অপারেশনের দেড় থেকে দুই বছর বাদে আমি বেলপুকুর হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার চাকরি নিয়ে। শনিবার অথবা রবিবার সময় পেলে নিশ্চিন্তপুরে একটা জায়গায় যেতাম বিনা পয়সায় রোগী দেখতে। ১০ বছর বাদে সেখানেই আবার বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার আবার দেখা। তিনি তখন বছর দুয়েক ধরে শয্যাশায়ী— আমাকে দেখবেন বলে তিনদিন ধরে একটা ঘর ভাড়া করে অপেক্ষা করছিলেন। আমি যেতেই আমাকে

নমস্কার করলেন। সেই রাত্রে তিনি মারা গেলেন।

না, এটা কোনো চমকপ্রদ গল্প নয়, নিখাদ সত্যি। জীবনে কত রকম প্রাপ্তি যে কী ভাবে কখন ঘটতে পারে, এটা তার একটা উদাহরণও বটে। তবে বড়ো বেশি বিয়োগান্ত আর নাটকীয়। উপন্যাস বা ফিল্মে এমন নাটকীয় পরিস্থিতি দেখলে আমি নিজেই হেসে ফেলি— 'কাঁচা কাজ' বলে।

ব্লাড ডোনেশান

বেলপুকুর হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে অপারেশনের জন্য অথবা অনেক সময় ইমার্জেন্সি রোগীর জন্য রক্তের প্রয়োজন হত। সবচেয়ে কাছের ব্লাড ব্যাঙ্ক ডায়মন্ড হারবারে। সরকারি ব্যবস্থা, কম খরচ, কিন্তু কম স্টক। কারও রক্তের প্রয়োজন হলেও 'ডোনার কার্ড'- এর জন্য ছোটাছুটি অথবা রক্তদাতা (ডোনার) জোগাড় করতে হত। অন্যথা কলকাতা থেকে রক্ত কিনে আনতে হত।

মাস্টারমশাই অর্থাৎ সুদর্শনবাবু এক রাত্রে ক্যারাম খেলতে খেলতে বললেন— একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করুন না। এক কথায় নাকচ করে দিলাম। বললাম— আউটডোর, অপারেশন এইসব করে আমার অত সময় নেই। আর শনি-রবি আমি বাড়ি যাব। তাছাড়া এখানে কেউ রক্ত দেবে না। মাস্টারমশাই ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নন। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে আবার কয়েক সপ্তাহ বাদে কথাটা তুললেন। আমি আপত্তি করা শুরু করার আগেই বললেন— গুরু, কথাটা শুনুন না— আপনাকে কিছুই করতে হবে না, শুধু হাসপাতালে করার অনুমতি দেবেন আর থাকবেন— আর সব ব্যবস্থা আমি করে নেব।

ভরসা হল না কিন্তু নিমরাজি হয়ে গেলাম। দুই সপ্তাহ বাদে রক্তদান শিবির। রক্তদান শিবিরের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার বাড়ি না গিয়ে থেকে গেলাম, কারণ মাস্টারমশাইরা কী করবেন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। রাত্রি দশটার সময়ে সান্ধ্য আউটডোর শেষ করে হাসপাতালে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময়ে গ্রামের ১৫-২০টা ছেলে জলের পাম্প সেট ইত্যাদি নিয়ে হাজির। জিজ্ঞাসা করাতে বলল—হাসপাতাল পরিষ্কার করব। পাম্প দিয়ে পুকুর থেকে জল তুলে রাত ১২টার মধ্যে হাসপাতাল ঝকঝকে করে দিল। আমি শুধু বসে থাকলাম আর কাজের শেষে ছেলেগুলোকে চা আর রুটি খাওয়ালাম।

রবিবার সকালে উঠে দেখি এক গাদা লোক হাসপাতালের মাঠে নানা কাজে ব্যস্ত। একটা বড়ো চাঁদোয়া খাটিয়ে তাঁবু তৈরি। কয়েকজন রক্তদাতাদের নাম-ধাম লেখার জন্য একটা মোটা রেজিস্টার খাতা নিয়ে তৈরি। কিছু ভলান্টিয়ার রক্তদাতাদের এসকর্ট করার জন্য তৈরি। আমি অবাক— অনেককেই আমি চিনি কিন্তু নাম জানি না। কিন্তু কী উৎসাহ, কী খুশি তারা এই কাজটা করতে পেরে!

রক্তদান শিবির নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। প্রথমবার ৫০-৬০ জন ডোনার ছিল। পরের বছর ৪০০-র বেশি অথচ কোনো প্রচার করা হয়নি, কোনো দলের রং লাগাতে হয়নি, কোনো অর্গানাইজিং কমিটি ছিল না— আমি শুধু বসে থাকলেই চলত। একটা কাজ অবশ্য আমি চালু করেছিলাম। ব্লাড ডোনেশান সার্ভিস। সমস্ত রক্তদান ইচ্ছুকদের নাম, ঠিকানা, ব্লাড গ্রুপ এবং শেষ কবে রক্তদান করেছেন ইত্যাদি একটা মোটা খাতায় লেখা ছিল। কিছু দিনের মধ্যেই ওখানকার মানুষে জেনে গিয়েছিল যে রক্তদান করার লোকের প্রয়োজন হলে বেলপুকুর হাসপাতাল থেকে অন্তত তিনজনের নাম পাওয়া যাবে।

আমি চলে আসার পরে অবশ্য এটা আর চালু রাখা যায়নি কারণ এই খাতাটা আপডেট করার লোক ছিল না। আমার পরে বেলপুকুর হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের এত ফালতু সময় ছিল না।

পঞ্চায়েতের সঙ্গে সম্পর্ক

ছাপ-মারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোনো দিনই সহজ ছিল না। মেডিক্যাল কলেজে হাউস-স্টাফশিপের সময়ে বেশির ভাগ হাউসস্টাফ মাইনে বৃদ্ধির জন্য স্ট্রাইক করলেও আমি করিনি। কারণ আমি মনে করেছিলাম যে আমি হাউস-স্টাফের কাজটা স্বেচ্ছায় করতে রাজি হয়েছি। সুতরাং মাইনে বৃদ্ধির দাবিতে আমি কাজ বন্ধ করতে পারি না। সরকার অনুগত হাউস স্টাফের দল ভেবেছিল আমি হয়তো তাদের পক্ষে কিন্তু আমাদের রোগী ভর্তির দিনে তারা সাহায্য করতে আসামাত্র আমি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

বেলপুকুরেও কয়েক দিনের মধ্যেই স্থানীয় বাম নেতৃত্বের সঙ্গে আমার খুব গন্ডগোল বেঁধে গিয়েছিল। সেই ঘটনার ফলে রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি হয়েছিল। ফলে হাসপাতালের মাঠের বেআইনি দোকানপাট সব উঠে গেল। কংগ্রেস কর্মীরা এসে একটা বাঁশের বাউন্ডারি তৈরি করে দিল। পরের পঞ্চায়েত ভোটে তারাই জিতল, কিন্তু আমার সঙ্গে হাসপাতালের মাঠে পুজোর অনুমতিকে কেন্দ্র করে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পুজো করতে দিইনি। প্রথমে যারা ভেবেছিল আমি কংগ্রেস-ঘেঁষা, তারা নিশ্চিত হল আমি তা হলে নকশাল নিশ্চয়ই। এরপর স্থানীয় কিছু নকশাল কর্মী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু তাদের দল এবং তার হাজার হাজার ভাগ নিয়ে আমি এত ঠাট্টা করি যে তারাও আমাকে দলভুক্ত করার আশা ত্যাগ করল। এতদিনে লোকে সত্যিই মানতে রাজি হল যে 'অ'-পলিটিক্যাল' মানুষ হওয়া সম্ভব।

সার্জারি বন্ধ করো

বেলপুকুর হাসপাতালে আমি যখন প্রথম অপারেশন শুরু করি, তখন সরকারি স্বাস্থ্য দফতরে জেলার স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রধান আধিকারিক সি.এম.ও.এইচ. (CMOH) আমার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

তখন ওই এলাকায় অনেকগুলো নার্সিংহোম ছিল— ছোটো-বড়ো মিলিয়ে। সবগুলোই ভালো চলত। বেলপুকুর হাসপাতালে অপারেশন ভাল করে চালু হয়ে যেতেই এদের ব্যাবসা কমতে শুরু করল। কারণ খুবই সহজ— বেলপুকুর হাসপাতালে অ্যাপেনডিক্স বাদ দিতে রোগীদের খরচ ছিল ২০০ টাকা, কিন্তু নার্সিংহোমে অন্তত ২০০০ টাকা। অন্যান্য অপারেশনের ক্ষেত্রেও তাই। তা ছাড়া বেলপুকুর হাসপাতালে এমন অনেক অপারেশন হচ্ছিল যেগুলো এই সব নার্সিংহোমে করা সম্ভব হত না।

একে একে নার্সিংহোমগুলো বন্ধ হতে শুরু করল। আমাকে টোপ দেওয়া হল সপ্তাহে ১ দিন এক নার্সিংহোমে যাব, ২ ঘণ্টার জন্য, তা হলে ২৫,০০০ টাকা দেবে। যদি কোনো অপারেশন করি, তার ফি অবশ্যই আলাদা। এর পর আমার এক সহকর্মী এসে দুই-এক দিন একটা বিশেষ নার্সিংহোমে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। বললেন, ''বস্, যে মানুষগুলো হাসপাতালে আসতে পারে না, তাদের একটু নার্সিংহোমে করে দাও না— ওরাও তো রোগী।'' সময়ের অভাবের অজুহাত দিয়ে আমি না করে দিলাম। ভাবছিলাম ওরা এবার কী চেষ্টা

করবে। এমন সময়ে মহকুমার এসিএমওএইচ. (ACMOH— অ্যাডিশন্যাল চিফ মেডিকেল অফিসার অব হেলথ) একদিন এসে হাজির। আমি ওঁকে অনেকদিন ধরেই চিনি— অতি ভদ্র আর ভালো মানুষ। বেশ কিছুক্ষণ একথা সে কথা বলে আমাকে জানালেন যে সিএমওএইচ-ই (CMOH) বলে পাঠিয়েছেন বেলপুকুর হাসপাতালে অপারেশন বন্ধ করে দিতে। এই সি.এম.ও.এইচ. কিন্তু প্রথমে অপারেশন করায় আমাকে বেশ উৎসাহ দিয়েছিলেন। আমি বললাম— 'সিএমওএইচ-এর কথায় আমি অপারেশন শুরু করিনি। তিনি আমাকে কোনো দিনই কোনো ভাবে সাহায্য করেননি। কোনো অসুবিধা হলে তিনি আমাকে রক্ষা করবেন সেই আশাও আমি করি না। আমি আমার মতন করে যাব।"

সি.এম.ও.এইচ.-এর এই আচরণ অবশ্য স্বাভাবিক। কারণ জেলার নার্সিং হোমগুলোর লাইসেন্স ফী থেকে কাদের যেন একটা নিয়মিত রোজগার হত। বেলপুকুর হাসপাতালে অপারেশন হওয়ার ফলে ওখানে তিনটে বাদে আর সব কটা নার্সিং হোমই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল— তাই এত বিরক্তি। আমি সি.এম.ও.এইচ. হলে হয়তো আমারও প্রতিক্রিয়া একই রকম হত— কে জানে!

তাহলে কী শিখলাম?

এই একটা মুশকিল। আমি আমার মতো করে কাজ করে গেছি, যত দিন যতটা ভাল লেগেছে, ততটা করেছি। সেটা নিয়ে এত সাতকাহন লেখা আমার কর্ম নয়। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র বন্ধুদের অনুরোধে ঢেঁকি গিলেছি বটে, কিন্তু তারপরে 'কী শিখলাম?' ধরনের গুরুগম্ভীর কথা আওড়ানোর ব্যাপারটা আমার আসে না। তবু, লেখাটা শেষ করতে গেলে এমন একটা উপসংহার না হলে নাকি মানায় না, সুতরাং আমার যা মনে হয়েছে তাই লিখছি, বুদ্ধিমান পাঠক এখানেই পত্রিকা বন্ধ করবেন এই আশা রাখি।

১. আমিই মালিক, আমিই করছি : এই ভাবনাটা সকলের মধ্যে আসাটা জরুরি। মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে আমি মনে করতাম বেলপুকুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র আমার জায়গা, একবারে নিজের জায়গা। বেলপুকুর হাসপাতালের আর সমস্ত স্টাফ আস্তে আস্তে সেটাই মনে করতে শুরু করল—না, তারা এটা ভাবত না বেলপুকুর হাসপাতাল ডাক্তার অনিরুদ্ধ সেনগুপ্তের জায়গা। তারা প্রত্যেকে জেনে গিয়েছিল— ওটা তাদের প্রত্যেকের নিজের, একেবারে নিজের জায়গা। কোন্ ফুসমন্তরে এটা হয়েছিল তা আমি জানি না। তবে আমার মনের মধ্যে সব সময়েই এমন একটা ভাবনা ছিল প্রত্যেকে যেন নিজেকে মালিক মনে করে। সে ভাবনাটা কেমন করে সকলের মধ্যে চারিয়ে গিয়েছিল। আর শুধু কর্মীদের মধ্যে বলছি কেন? বেলপুকুরের লোকজন 'নিজেদের হাসপাতাল' নিয়ে রীতিমতো গর্ব করত, আশপাশের লোকরা এখানে রোগী দেখাতে এলে বেলপুকুরের মানুষ ভাবত, তারা নিজেরা কোথায় যেন জিতে গেছে!
এটা না হলে, এই গর্ব এই আনন্দ না হলে, কাজটাই ভারি হয়ে কাঁধে চেপে বসে, কাজের আনন্দ ব্যাপারটা দিবাস্বপ্ন শোনায়।

২. স্থূলে ভুল কখনও নয় : চিকিৎসাশাস্ত্রটা একটা ফলিত বিজ্ঞান। মানে, কোন্ কাজটা ঠিক কোন্ ভাবে করতে হবে, সেটা এই শাস্ত্র পড়ে, শিখে, নিজে কাজ করে, বোঝা যায়। কিন্তু সব কাজের গুরুত্ব সমান নয়। কিছু কাজ না করলে রোগীর বিপদ, আর কিছু কাজ না করলে খুব অসুবিধে হয়, আবার আরও কিছু কাজ করা স্রেফ খানিক সুবিধা হয় আর দেখায় ভাল বলে। আমাকে বাছতে হয়েছিল কোন্ কাজটা না করলে নয়। যেমন আমাদের অপারেশন থিয়েটার ঘরটা এমনিতে ভাঙাচোরাই ছিল বলা যায়, কিন্তু অপারেশন করার সময় আসেপসিস-এর ব্যাপারে কোনো আপোশ হতেই দিতাম না। আসেপসিস মানে রোগীর শরীরে বা ক্ষতস্থানে যেন কোনো জীবাণু ঢুকতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। তার জন্য ঠিক ভাবে হাত ধোওয়া, স্টেরিলাইজ করা গ্লাভস, গজ, যন্ত্রপাতি সব ব্যবহার করা, আর সে সব এমন ভাবে ব্যবহার করা যে ডাক্তার নার্স বা অন্য কোনো কর্মীর হাত বা শরীর থেকে জীবাণু না আসতে পারে। আমি এ সব ব্যাপারে ভীষণ কড়া ছিলাম, পান থেকে চুন খসলেই এমন চেঁচামেচি জুড়ে দিতাম যে অন্যরা শিখতে বাধ্য হত— এসব ব্যাপারে এতটুকু ভুল যে আমি সহ্য করব না সেটা বুঝে যেত।

আর অপারেশন থিয়েটারে উপযুক্ত আলো খুব দরকার, কিন্তু যত দিন সেটা না পাচ্ছি ততদিন জোরালো টর্চের আলো দিয়ে কাজ চালানো সম্ভব, খালি যে কর্মী আলোটা ধরে থাকবে তাকে হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথার ওপর হাত তুলে একটুও না নড়ে আলোটা ধরতে হবে। কাজটা করার চেষ্টা করে দেখবেন—একেবারে সহজ কাজ নয় এটা! কিন্তু যে কর্মী এটা করত, সে খুব গর্ব আর উৎসাহ নিয়েই কাজটা করত, কেননা সে জানত সে একজন মানুষের প্রাণ বাঁচাচ্ছে।

অপারেশন থিয়েটারটা চকচকে হলে, পাশে একটা ঠিকঠাক বসার ঘর থাকলে, দরজায় স্প্রিং দেওয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকলে খুব ভালো হত— সে সব বেলপুকুরের ছিল না। ওসব করার চেষ্টাও আমি করিনি, কারণ ওগুলো 'সুবিধা' আর 'দেখায় ভালো'— গোত্রের। ওসব না করলে রোগীর রোগ সারা কিছু কম হত না। এই সব কাজের পিছনে না দৌড়ে আমি বরং চেষ্টা করতাম যেটুকু করতে পারা যায় সেটা যেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রতি রোগীর জন্য, প্রতিটা কর্মী পুরোমাত্রায় করেন। ব্যাস্।

৩. প্রত্যেক কর্মীকে কিছু বেশি দাও : না, টাকা পয়সা নয়। তবে কী? দায়িত্ব আর তার সঙ্গে এই স্বীকৃতি যে সেই রোগীকে বাঁচাচ্ছে, সে একজন হুকুম-তামিল-করনেওয়ালা মাত্র নয়, সে একটা টিমের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, আর সেই টিমের একজন সদস্য ফেল করলেই গোটা টিমটাই হেরে যায়, রোগী যায় মরে। সে-ই বাঁচাচ্ছে রোগীকে—আর কথাটা তো মিথ্যে নয়! যার কাজ ছিল রোগীর নাম ধরে ডাকার, তাকে আমি অতিরিক্ত খাটিয়ে নিতাম—ঘণ্টার পর ঘণ্টা টর্চটা সে সোজা ধরে রাখত, একটু এদিক ওদিক হলেই আমি চেঁচাতাম, বকতাম। আর সে বুঝত, তার মধ্যে একটা মানুষ আছে যে রোগীর-নাম-ডাক মানুষটার চাইতে বড়, ঢের ঢের বড়, আর সেই মানুষটার নাম রোগীর-প্রাণ-বাঁচানো মানুষ।

৪. ঝুঁকি নাও : তবে দেখে শুনে, জেনে বুঝে, ওই পরিস্থিতিতে সেটাই রোগীর পক্ষে সব থেকে ভালো, এইটা বুঝলে তবেই। যাকে অপারেশন না করে রেফার করে দিলে রাস্তাতেই মরে যাবে (বা পরে দেখেছিলাম, যে হাসপাতালে পাঠাচ্ছি, সেখানেই চিকিৎসা না পেয়ে মরবে), তাকে অপারেশন টেবিলে তুলে আমি আর কতটা ক্ষতি করতে পারি? তবে হ্যাঁ, রেফার করে দিলে রাতের সুনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটবে না, রোগীর ভিড় বাড়বে না, কাজ কমবে। অপারেশন করলে তার জন্য পড়তে হবে, খাটতে হবে, আমার কাছে যেটুকু আছে তার পুরোটাই দিতে হবে, সবাই মিলে কতটা সম্ভব ততটাই করতে হবে। করতে করতে নিজের ওপর আস্থা জন্মে যায়, আমার, আমার কর্মীদের প্রত্যেকের। আর

চিকিৎসা বা অপারেশনের মূল নীতি থেকে কখনই সরব না, এইটা মাথায় রাখতাম— ঝুঁকি নেওয়া, কিন্তু অবিবেচনা নয়।

৫. এ কোনো সমাজসেবা নয় : তবে কী? অন্য কে কী ভাবে, আমি জানি না। আমি সমাজসেবা করছি, মানুষের উপকার করছি, এমনটা ভেবে কাজ করিনি, করতে পারিও না। আমি করেছি, কেন না করতে ভাল লেগেছে, করে তৃপ্তি পেয়েছি। এক অর্থে আমি কাজ করেছি আমার নিজের জন্যই, আর কারও জন্য নয়। যদি কারও ভাল হয়ে থাকে, সেটা উপরি পাওনা, ব্যাস।

৬। 'না, হবে না' - বলার লোকদের তাড়াও : এ দেশের কিস্যু হবে না। এই অজ পাড়াগাঁয়ে কিস্যু হবে না। সরকারি ব্যবস্থায় কিস্যু হবে না। ভাঙা ঘরে কিস্যু হবে না। ফাঁকিবাজ কর্মচারী, কিস্যু হবে না। কেন খামোকা নিজের ঘাড়ে এতটা ঝুঁকি নিচ্ছ? ভাববেন না এসব কথা বলার লোকের কিছুমাত্র অভাব ছিল বেলপুকুরে। কোথাও এদের অভাব নেই। এদের কথা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়েছি, আর যখন পেরেছি এদেরই কান ধরে বের করে দিয়েছি।

তবে কানটা খোলা রাখতেও হয়েছে। কেননা সবাই তো আর 'করা যায় না'-র অজুহাত খাড়া করছিল না। অনেকেই বলছিল, এই কাজটা করতে পারা যাবে না, কারণ এই সব অসুবিধা আছে। অসুবিধা তো সত্যিই ছিল, সেগুলো শুনতে জানতে বুঝতে হয়েছে, তারপর কতটা অসুবিধা কী ভাবে দূর করা যায় তার চেষ্টা করতে হয়েছে।

সবশেষে

কেন ছাড়লাম বেলপুকুর : বেশ তো মৌরসিপাট্টা গেড়ে বসেছিলাম, লোকে বেশ ভগবান-ভগবান বানাচ্ছিল, তবে পোকাটা কামড়াল কোথায়? কেন ছাড়লাম বেলপুকুর, কেন ছাড়লাম রাজ্য সরকারের চাকরি?

সত্যি উত্তরটা কি আমিই ছাই জানি? তবু মাঝে মধ্যে যদি খুব ভাবি (মাপ করবেন, আমি ভাবিয়ে লোক নই একদমই, ওই মাঝে মধ্যে ভুল করেই ভাবা কাজটা করে ফেলি), তা হলে কটা কথা মনে হয়। প্রথমত, জীবনটাকে একটা খাতে বইয়ে দিলে, সেভাবেই যেতে দিলে নিজেকে, কোথায় যেন একটা কিছু কম পড়ে যায়। নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ সামনে না থাকলে মনে হতেই পারে কী এক ভগবান আমি, আমার ছোটো ঘেরাটোপের পৃথিবীতে। সেটা না ভাঙলে চলে না, অন্তত আমার চলেনি।

দ্বিতীয় কথাটা হল, বেলপুকুর তো আমাকে অনেক শিখিয়েছে— সেই শেখাটা অন্যত্র কাজে লাগানো যায় কি? গেলে, কীভাবে যায়? সেটা একবার দেখবার বাসনা বড়ো দুর্নিবার। আর আমাকে ছাড়া বেলপুকুর কেমন থাকে, কেমন ভাবে সে নিজের হাসপাতাল নিজের রোগভোগ নিজের জীবন-যাপন সামলায়, সেটাও তো দেখার দরকার।

অতএব, এক গ্রামের ডাক্তারের গল্প-র শেষ পর্বের এখানেই যবনিকা।

লেখক পরিচিতি : ডা. অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত, এমবিবিএস, বেলপুকুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রাক্তন চিকিৎসক, বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কর্মরত।

With Best Compliment
from

A. N. Pharmacia Laboratories Pvt. Ltd.
Celebrating 30 Years
Recognised Nationally And Internationally

সন্দীপ্তাকে মনে রেখে

মেয়েদের মূত্রনালীতে সংক্রমণ

(ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন বা ইউটিআই)

মেয়েদের মূত্রনালীতে সংক্রমণ বা ইউটিআই ছেলেদের তুলনায় বেশি হয়। কারণটা খানিকটা শারীরিক, আর অনেকটাই সামাজিক। এটা কিন্তু অনেকটাই আটকানো যায়— লিখছেন **ডা. প্রতাপশঙ্কর দত্ত।**

গত পাঁচ দশক ধরে চিকিৎসা বিশেষত অস্ত্রচিকিৎসার সঙ্গে জড়িত আছি। জেনারেল সার্জারি তো বটেই মূত্রাশয় সংক্রান্ত নানাবিধ রোগ কখনও ওষুধ, প্রয়োজনে অস্ত্র প্রয়োগ করে রোগগ্রস্ত মানুষকে নিরাময়ের চেষ্টা করেছি। পাঁচ দশক আগে বিদেশে, তারপর এ দেশে মুত্রনালীর সংক্রমণ খুবই কম পেয়েছি। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজে জীবনযাত্রা বদলের সঙ্গে সঙ্গে মূত্রনালীর সংক্রমণ বহুগুণ বাড়তে দেখেছি, গত তিন দশকের বেশি সময়ে, বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে। কারণ, মেয়েরা আগের তুলনায় অনেক বেশি পড়াশোনা করতে বেরোচ্ছেন, তারপর কর্মস্থলে। আর কে না জানেন, আমাদের দেশে শৌচালয়ের কত অভাব এবং থাকলেও তা কতটা অস্বাস্থ্যকর।

চিকিৎসক হিসাবে এ কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে মূত্রাশয় সংক্রান্ত রোগে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি ভোগেন, বিশেষত মূত্রনালীর সংক্রমণের ক্ষেত্রে। প্রথমে বলে রাখি, মূত্র ত্যাগের মাধ্যমে শরীর থেকে বর্জ্য এবং দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। প্রক্রিয়াটি ছাঁকনির মতো কাজ করে।

কেন মেয়েরা বেশি ভোগেন?

আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক ব্যবস্থা এজন্য অনেকাংশে দায়ী। প্রথমত, বর্তমান সমাজে পুরুষদের সঙ্গে মহিলারাও কাজের সূত্রে বাড়ির বাইরে অনেকক্ষণ থাকেন। পথে এবং কার্যালয়ে শৌচালয়ের অভাব এবং পরিচ্ছন্ন শৌচালয়ের অভাবে মেয়েরা বহুক্ষণ মূত্রত্যাগ করেন না। এবং কষ্টের সঙ্গে তা ধরে রাখতে বাধ্য হন। কোনো জলাধারে যেমন অনেকক্ষণ জল ধরা থাকলে বীজাণু জন্মানো সহজ, সেই নিয়মে মহিলাদের মূত্রাশয়ে সংক্রমণও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয়ত, মহিলাদের মূত্রনালী (৫ সেমি) পুরুষদের তুলনায় (১৬-১৮ সেমি) ছোটো হওয়ায় বহিরাগত সংক্রমণ সহজেই হয়। এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে মূত্রত্যাগের পথ পুরুষের তুলনায় মলদ্বারের (anus) অনেক কাছাকাছি। ফলে অন্ত্রে (intestine) থাকা জীবাণু মলদ্বার হয়ে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

অন্যান্য কারণগুলো অবশ্য পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করে না। যেমন সমগ্র মূত্র নির্গমন পদ্ধতির (কিডনি, ইউরেটার, ব্লাডার, ইউরেথ্রা) কোনো অসুখ। যেমন কিডনি সংক্রমণ বা পাথর, কিংবা মূত্রাশয়ে সংক্রমণ বা পাথর বা টিউমার— যেগুলো ওপর থেকে সংক্রমণ বয়ে নিয়ে মূত্রাশয়ে আসে।

বাইরের থেকে মহিলাদের মূত্রাশয়ে আক্রমণ সাধারণত মূত্রনালীর দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় সহজ হয়। নিজস্ব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতারও খুব প্রয়োজন হয়। মহিলারা শৌচালয়ের অভাবে বহুক্ষণ জল না খেয়ে থাকেন। তাও সংক্রমণে সহায়তা করে।

অধিক সন্তানের জন্ম দিলে মহিলাদের ক্ষেত্রে আরও একটা বড়ো রোগ হয়, যা সংক্রমণের বড়ো কারণ হতে পারে। তা হল মূত্রাশয়ের জরায়ুর সামনে নেমে আসা এবং থলির মতো হয়ে থাকা। সেটা মূত্র নিষ্কাশনে বাধার সৃষ্টি করে (cystocele)।

সংক্রমণ কী করে বুঝবেন?

১. বারবার প্রস্রাব হবে।
২. প্রস্রাবের সময় জ্বালা করবে।
৩. রক্ত প্রস্রাব হতে পারে।
৪. জ্বর হবে, সেই সঙ্গে কাঁপুনি হতে পারে।

কী করতে হবে?

১. প্রচুর জল খেতে হবে।
২. প্রস্রাব দ্রুত পরীক্ষা করতে দিতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে।
৩. নিজস্ব পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে।
৪. বারবার সংক্রমণ হলে চিকিৎসকের পরামর্শমতো অনুসন্ধান পদ্ধতি মানতে হবে, যাতে কিডনি ফেলিওরের মতো গুরুতর সমস্যা তৈরি না হয়।

কী কী জীবাণু?

সাধারণত যে সব জীবাণু এ ধরনের সংক্রমণ ঘটায়, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ই. কোলি (Escherichia coli, যাকে সহজ ভাষায় বি. কোলি সংক্রমণ বলা হয়)। তাছাড়া Klebsella group, ও নানা যৌন রোগ (veneral disease) সংক্রামক হিসাবে ভোগাতে পারে। সবচেয়ে বেশি ভোগাতে পারে Pseudomonas Pyosinus সংক্রমণ।

অনেকেরই মূত্রনালীতে বারবার সংক্রমণ হয় কেন?

আগেই বলেছি, মহিলাদের মূত্রত্যাগের নালীটা ছোটো বলে বারবার সংক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। আর ব্যক্তিগত অপরিচ্ছন্নতাও অনেকটা দায়ী।

সাধারণত সংক্রমণ এড়াতে মেয়েদের কী কী করা উচিত?

অবশ্যই জল বেশি খাওয়া উচিত। মূত্র অনেকক্ষণ চেপে থাকা উচিত নয়। মূত্রত্যাগের পর ওই জায়গা জল দিয়ে খুব ভালো করে পরিষ্কার করতেই হবে।

অনেক অফিসেই পেপার-রোল থাকে। কিন্তু অফিসে বা বাইরে পাবলিক টয়লেটে রাখা টয়লেট-রোল কতটা পরিষ্কার, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ফলে জলের ব্যবহারই নিরাপদ। কোনো জায়গায় জলের ব্যবস্থা না থাকলে পরে সুযোগ পাওয়া মাত্রই জল দিয়ে মূত্রত্যাগের জায়গাটা ধুয়ে ফেলতেই হবে। অন্তর্বাস খুবই পরিষ্কার রাখতে হবে। সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মূত্র নিষ্ক্রমণের পথে কোনো বাধা থাকতে পারে। যেমন পাথর বা বারবার সংক্রমণের জেরে নিষ্ক্রমণের পথ ছোটো হয়ে যাওয়া। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সঙ্গে অতি অবশ্যই পরামর্শ করুন। অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে গর্ভস্থ সন্তানের চাপ মূত্রাশয়ে পড়ে, মূত্র ত্যাগের রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

লেখক পরিচিতি : ডা. প্রতাপশঙ্কর দত্ত, এফআরসিএস, ইউরোলজিস্ট এবং সার্জন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

চি ঠি প ত্র

প্রিয় সম্পাদক,

আমি *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। আমার মতো আরও অনেক মানুষ এই পত্রিকার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারে বলেই আমার ধারণা। শুধু জানা নয়, ব্যাবহারিক জীবনে সচেতনতা ও প্রয়োগ দুইয়ের ক্ষেত্রেই এই পত্রিকা বিশেষ উপযোগী। তাই এই পত্রিকার অক্টোবর-নভেম্বর (২০১৪) সংখ্যায় প্রকাশিত ডা. পুণ্যব্রত গুণ মহাশয়ের লেখা 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চিকিৎসা পরিষেবা : ঘোষণা ও বাস্তব'— এই প্রতিবেদন সম্বন্ধে আমি আমার মতামত না জানিয়ে পারছি না।

আমার মনে হয়েছে, লেখাটার মধ্যে কোথাও যেন একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আজ আমাদের দেশের উন্নতির শ্লথগতির অন্যতম কারণই হল এই দলীয় রাজনীতি সংক্রান্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ অন্বেষণ। উন্নতির প্রশ্নে খুঁত ধরার রাজনীতি ছেড়ে বরং কী ভাবে বাধা অতিক্রম করা সম্ভব, সে চেষ্টা করাই শ্রেয়। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে* 'বাণিজ্যিক নয় মানবিক' যেমন সত্যি, তেমন এই পত্রিকা যেন রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে পড়ে সেটা খেয়াল রাখাও জরুরি। সাধারণ মানুষ চায় পরিষেবা আর এও বলা হয়েছে যে গ্রামে বাস করা লোকের সংখ্যা শহরে বাস করা লোকের তুলনায় অনেক বেশি। গ্রাম ও শহরের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিরাট বৈষম্য। সেই বৈষম্যের পরিসংখ্যানও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পর 'গ্রামের মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তার কোথা থেকে পাওয়া যাবে, আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না'— এই মন্তব্য বড় হতাশাব্যঞ্জক। *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র সৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে এর যেন বিস্তর ফারাক। যারা জনস্বাস্থ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং যারা হাতে কলমে নিরন্তর কাজ করে চলেছেন, তারাই পারেন এই সমস্যার সমাধানের সুলুক সন্ধান দিতে। এই প্রশ্নটাই অন্য রকম হতে পারত— গ্রামের স্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তার কোথা থেকে পাওয়া যাবে? কেমন করে এ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে? এবং সরকারি প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তব এই চিত্রটার তফাত কী ভাবেই বা দূর করা যেতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলোর তুলনামূলক আলোচনাও এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলোর উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে সৎ কিন্তু যথেষ্ট পরিকল্পনা ও বিবেচনাবোধের অভাবে ক্লিষ্ট। তাই আমার অনুরোধ, সমালোচনা ও আলোচনার পাশাপাশি সমস্যার সমাধানের ওপর গুরুত্ব দিলে হয়ত স্বপ্নের এই স্বাস্থ্য পরিষেবা একদিন বাস্তবে পরিণত হবে।

সেই আশা রেখে, ধন্যবাদান্তে—

শ্রী অমল ভট্টচার্য,
হাওড়া।

অস্বাভাবিক ঋতুচক্র এবং ঋতুস্রাব

Dysfunctional Uterine Bleeding [DUB] & Abnormal Uterine Bleeding [AUB]

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের কাছে যে সমস্যাটা নিয়ে রোগীরা সবচেয়ে বেশি আসেন তা হল যোনিপথে অনেকটা ঋতুস্রাবের মতোই কিন্তু অস্বাভাবিক রক্তস্রাব। বেশির ভাগ মহিলারাই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থকেন। ঋতুমতী মহিলার জীবনে যে কেনও সময়েই এটা হতে পারে যদিও puberty (বয়ঃসন্ধি) এবং Menopause-এ (রজোনিবৃত্তিকাল) এই সমস্যাটা বেশি হয়— লিখছেন ডা. শিবেন্দ্রনাথ দাস।

স্বাভাবিক ঋতুস্রাব বলতে আমরা বুঝি ২৮ দিনের ঋতুচক্র, কিন্তু ২১-৩৫ দিনের মধ্যে হলেও তা স্বাভাবিক। গড় রক্তস্রাব ৪ দিন বা ১-৭ দিনের মধ্যে থাকতে পারে, গড় রক্তপাত হল ৪০ মি.লি.। যদি রক্তপাত ৮০ মি.লি.-এর বেশি হয় তখন সেটা অস্বাভাবিক।

সব মহিলার ঋতুস্রাব এক রকম হয় না। ফলে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় অনেকেরই মনে হয় যে, ওরটা ঠিক আর নিজেরটা অস্বাভাবিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তাররা ঋতুচক্রের ইতিহাস খুঁটিয়ে নেওয়ার পরে দেখা যায় যে সেটা অস্বাভাবিক নয় বরং স্বাভাবিক (normal variation)। এজন্যই প্রত্যেক মেয়েকে বয়ঃসন্ধিকালে শারীর শিক্ষা (health education)-এর মাধ্যমে ঋতুচক্র সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অস্বাভাবিক রক্তস্রাব অনেক কারণেই হতে পারে। কিন্তু DUB (Dusfunctional Uterine Bleeding) আমরা তখনই বলি যখন অন্য Pelvic Pathology (পেটের নীচের অংশ যেমন জননতন্ত্রের কোনও ব্যাধি) অথবা কোনো জানা ডাক্তারি কারণ এর মধ্যে জড়িত থাকে না। অর্থাৎ *এ রোগ নির্ণয় করা হয় অন্য রোগ বাতিল করার মাধ্যমে (Method of exclusion)*।

তা হলে DUB কেন হয়?

এর প্রধান কারণ হল যৌন হরমোনের (sex hormones) ভারসাম্যহীনতা (imbalance), যার জন্য এটা বয়ঃসন্ধিকালে এবং রজোনিবৃত্তিকালে (menopause) সবচেয়ে বেশি হয়। এই সময়ে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নিঃসরণ (ovulation) অত্যন্ত অনিয়মিত হয়ে থাকে, ফলে হরমোন ইস্ট্রোজেন (oestrogen) এবং প্রজেস্টেরন (progesterone)-এর মধ্যে ভারসাম্য হারিয়ে যায়। ডিম্বাশয় ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন তৈরি করে। ডিম্বাণু নিঃসরণ না হওয়ার জন্য করপাস লুটিয়াম তৈরি হয় না, ফলে প্রজেস্টেরনও নিঃসরণ হয় না। প্রজেস্টেরন হরমোন রক্তবহা নালীগুলোকে সংকুচিত করে, ফলে রক্তক্ষরণ কম হয়। এই হরমোন কমে গেলে রক্তস্রাব বেশি হয়।

এছাড়াও DUB কিছু মেডিক্যাল কারণে বা ওষুধ প্রয়োগের জন্যও হতে পারে।

মেডিক্যাল কিছু কারণ হল PCOS (পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম), জননতন্ত্রের প্রদাহ (Pelvic inflammatory disease), থাইরয়েড হরমোনের কম বা বেশি।

যে সব ওষুধ প্রয়োগে DUB হয়—

- গর্ভ নিরোধক বড়ি
- হরমোনের বড়ি
- যে ওষুধ রক্ত জমাট বাঁধতে (রক্ত তঞ্চন)-এ বাধা দেয় (হেপারিন, ওয়ারফেরিন ইত্যাদি)।

এবার জানা যাক বিভিন্ন রকমের অস্বাভাবিক ঋতুচক্র

১. ঋতুস্রাবে বেশি রক্তপাত (Menorrhagia) : যখন মাসিক ৭ দিনের বেশি হয় বা প্রচুর রক্ত চাকা বা ডেলা বের হয় বা প্রতি ঘণ্টায় প্যাড ভিজে যায়, কিন্তু ঋতুচক্র নিয়মিতভাবে হয়।

২. কম ব্যবধানে ঋতুস্রাব (Polymenorrhoea): যখন মাসিক ২১ দিনের কম ব্যবধানে হয়।

৩. বেশি ব্যবধানে ঋতুস্রাব : যেখানে মাসিক হয় ৪৫ দিনের বেশি ব্যবধানে।

৪. অনিয়মিত ঋতুস্রাব (Metrorrhagia) : যেখানে ঋতুচক্র নিয়মিত নয়।

৫. অনিয়মিত অতিরিক্ত ঋতুস্রাব (Menometrorrhagia): যেখানে ঋতুস্রাব অত্যাধিক এবং অনেকদিন ধরে হয় এবং অনিয়মিত চক্র।

কী করে DUB নির্ণয় করতে হবে?

যেহেতু অন্য রোগ বাতিল করার মাধ্যমে DUB নির্ণয় করা হয়, এজন্য কী কী কারণে জরায়ু থেকে অস্বাভাবিক রক্তপাত হয় তার একটা ধারণা থাকতে হবে। নীচে একটা তালিকা দেওয়া হল—

১. গর্ভপাত বা গর্ভনালীতে ভ্রূণ (ectopic pregnancy) বা gestational trophoblastic disease। শেষের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা জটিল, তাই সে চেষ্টা করছি না।

২. সংক্রমণ : জননতন্ত্রের প্রদাহ, যথা জরায়ু মুখের প্রদাহ, জরায়ুর ভেতরকার আবরণীর প্রদাহ।

৩. জরায়ু বা ডিম্বাশয়তে কোনো রোগ যেমন —
   - টিউমার (লিওমায়োমা)
   - জরায়ুর পলিপ বা মাংসপিণ্ড

- ইস্ট্রোজেন তৈরি করে, ডিম্বাশয়ে এমন টিউমার
- জরায়ুর ভেতরকার আবরণীর অতিবৃদ্ধি বা ক্যানসার

৪. দেহের কিছু রোগ
- থাইরয়েডের রোগ
- লিভারের রোগ
- রক্ততঞ্চনের রোগ

৫. ওষুধের জন্য
- গর্ভনিরোধক বড়ি আপৎকালীন গর্ভনিরোধক বড়ি
- গর্ভনিরোধের জন্য লুপ (Intra-uterine contraceptive device–IUCD)
- হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি—বাইরের থেকে ইস্ট্রোজেন এবং অথবা প্রজেস্ট্রেরন দিয়ে

রোগ নির্ণয়ের জন্য

রোগীকে সাধারণত কিছু প্রশ্ন করলে বোঝা যায় এটা DUB —

- তার ঋতুচক্রের বিস্তারিত ইতিহাস
- কতদিনের রক্তস্রাব? স্পটিং (ঋতুচক্রের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তস্রাব) হয় কিনা?

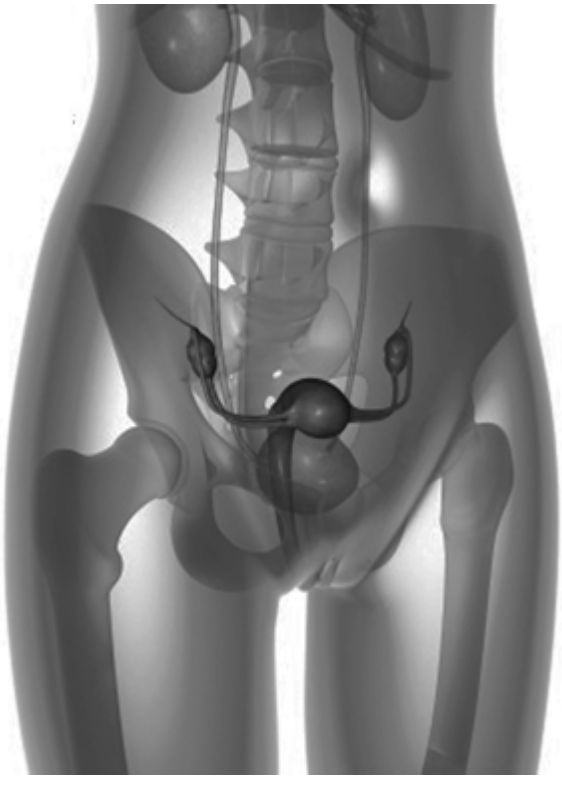

- কতগুলো প্যাড প্রতিদিন দরকার
- দৈনিক জীবন যাত্রার ওপর কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা, যেমন—দুর্বলতা, মাথাঘোরা ইত্যাদি
- অন্য কোনো জায়গা থেকে রক্তপাত, যেমন— দাঁতের মাড়ী থেকে বা ছোটো কাটা থেকে অনেকক্ষণ ধরে রক্তপাত বা দেহে বিনা আঘাতে কালশিটে পড়া
- অত্যধিক ওজন বাড়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, চুল পড়া, পা ফোলা, হাঁপিয়ে যাওয়া
- যৌন জীবন সংক্রান্ত ইতিহাস এবং গর্ভনিরোধক বড়ি ও অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার করা ইত্যাদি

যোনি এবং জরায়ুর পরীক্ষা করা প্রয়োজন যাতে কোনো টিউমার অথবা গর্ভাবস্থা সংক্রান্ত কোনো জটিলতাকে বাদ দেওয়া যায়। মেডিক্যাল ইতিহাস ছাড়া কতগুলো পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা DUB নির্ণয় করতে পারি।

- আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে জনন অঙ্গের (Reproductive organ) কোনো অস্বাভাবিক টিউমার বা মাংসপিণ্ড বা জরায়ুর ভেতরের আবরণীর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে কিনা জানতে পারি
- রক্তের পরীক্ষা
- রক্তের সমস্ত কণিকার সংখ্যা ও চরিত্র পরীক্ষা, হিমোগ্লোবিন
- রক্ততঞ্চনের পরীক্ষা— যেমন রক্তক্ষরণ সময়, রক্ততঞ্চন সময় ও প্রথ্রোম্বিন সময়
- থাইরয়েড হরমোনের পরীক্ষা
- এফ এস এইচ (Follicular Stimulating Hormone), এল এইচ (Leutinising Hormone) রক্তরসে টেস্টোস্টেরন, ইত্যাদি হরমোনের মাত্রা পরীক্ষা— যদি PCOS বলে মনে হয়
- জরায়ুর ভেতরের আবরণীর বায়োপ্সি— এটা করলে পলিপ বা ক্যানসার বাদ দেওয়া বা ধরা যায়।

চিকিৎসার মাধ্যমে কি DUB নির্মূল করা সম্ভব?

DUB চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হল—রক্তপাত কমানো, ঋতুচক্রকে নিয়মিত করা, রক্তল্পতা বোধ করা।

মোটামুটি নিম্নলিখিত গ্রুপের ওষুধ ব্যবহার করা হয়—

- স্টেরয়েড নয় এমন প্রদাহরোধী ওষুধ। ইংরাজিতে সংক্ষেপে বলে NSAID, যেমন মেটানামিক অ্যাসিড (Metanamic acid)
- Ethamsylate এবং Tranexamic acid
- গর্ভনিরোধক বড়ি (OCP)
- প্রজেস্টিন (Progestin) বড়ি
- Levonorgestrel Intra Uterine Device (MIRENA)
- সার্জারি : ওষুধ যদি অসুখ নির্মূল না করতে পারে তখন এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপ্সি অথবা জরায়ু কেটে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসার জন্য

DUB-কে তিনটে গ্রুপে ভাগ করা যেতে পারে

১. **বয়ঃসন্ধিকাল :** এই সময়ে ঋতুচক্র নিয়মিত হয় না, প্রথম ২-৩ বছর পর নিজের থেকেই সেটা ঠিক হয়ে যায়। এই সময়ে দরকার বাবা মায়ের এবং রোগীর সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা এবং তাদের আশ্বস্ত করা। অত্যধিক রক্তক্ষরণের ফলে রক্তাল্পতা হতে পারে, তার জন্য রোগীকে আয়রন এবং ফোলিক অ্যাসিড দেওয়া অথবা রক্তপাত বন্ধ করার জন্য NSAID, Tranexamic acid ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। এতেও যদি না হয় তা হলে প্রজেস্টিন দেওয়া যেতে পারে।

এই বয়সে হরমোন দেওয়া যথাযথ নয় কারণ এতে মেয়েদের বৃদ্ধির হার কমে যেতে পারে, কারণ এই ওষুধগুলি হাড়ের বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়।

২. **যে বয়সে মেয়েরা সন্তান ধারণ করে সেই বয়স**

এই সময়ে সাধারণত ওষুধ দেওয়া হয়—

- গর্ভনিরোধক বড়ি (OCP)
- কেবলমাত্র প্রজেস্টেরন হরমোনের বড়ি (Progesteron only pills)
- MIRENA IUCD আগে লেখা হয়েছে
- একটি ছোট অপারেশন— ডাইলেটেশন ও কিউরেটেজ— D and C (Dilatation and curretage)

৩. রজোনিবৃত্তিকালীন বয়স : এই বয়স কালে প্রথমে এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপ্সি করে তবেই ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা ভালো, কারণ এদের ক্ষেত্রে ক্যানসার বা ক্যানসার-পূর্ব অবস্থা বায়োপ্সি করে দেখে নেওয়া ভালো।

DUB চিকিৎসা না করলে কী হতে পারে?

আমাদের মতো গরিব দেশে অধিকাংশ নাগরিকরা চিকিৎসা পরিষেবার আওতায় আসতে পারেন না দারিদ্র, অজ্ঞতা, প্রত্যন্ত জায়গায় থাকার জন্য। এ সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক দিন ধরে রক্তপাত হওয়ার ফলে যখন রোগীরা চিকিৎসার জন্য আসেন তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তারা গভীর রক্তাল্পতায় ভুগছেন। আবার রজোনিবৃত্তিকালে (Menopause) এই রোগ অবহেলা করলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রোগীরা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই এরকম অস্বাভাবিক রক্তপাতকে অবহেলা করা উচিত নয়।

লেখক পরিচিতি : ডা. শিবেন্দ্রনাথ দাস, এমবিবিএস, এমডি, একটা কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালে স্ত্রীরোগ বিভাগের প্রধান চিকিৎসক।

ক্যুইজ

মৃগীরোগ সম্পর্কে আমরা সবাই শুনেছি কিন্তু রোগটার সম্পর্কে ঠিক ধারণা হয়তো নেই। এবার ক্যুইজ মৃগীরোগ নিয়ে। মৃগীরোগের প্রধান লক্ষণ খিঁচুনি আর এই খিঁচুনির কারণ মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক তড়িৎ প্রক্রিয়া। মৃগী ছাড়াও আরও কিছু কারণে খিঁচুনি হয়, যেমন—মেনিনজাইটিস, এনকেফেলাইটিস, মস্তিষ্কে টিউমার ও চোট, সোডিয়াম পটাশিয়াম আয়নের কমবেশি ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে কারণ নির্ণয় ও তার চিকিৎসা করলেই খিঁচুনি কমে যায়। প্রকৃত মৃগীরোগ নিয়ে আজকের

প্রশ্ন:

১. কখন খিঁচুনিকে মৃগীরোগ বলা হয়?
২. খিঁচুনি হলেই কি মৃগী হয়েছে বলা উচিত?
৩. মৃগী নির্ণয় করতে কোন নির্দিষ্টি পরীক্ষা করা হয়?
৪. স্কুল পড়ুয়া শিশুদের মধ্যে কোন ধরনের মৃগী বেশি ধরা পড়ে?
৫. মৃগীর একটা গুরুতর অবস্থার নাম 'স্ট্যাটাস এপিলেকটিকাস'। এটি কী?
৬. মৃগীরোগীর মোটর গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে কী সতর্কতা প্রযোজ্য?
৭. জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়মের জন্য মৃগীরোগীর খিঁচুনি শুরু হতে পারে?
৮. মৃগীরোগীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কোন ধরনের খিঁচুনি দেখা যায়?
৯. মৃগীরোগ প্রথম কবে রোগ হিসাবে বিবৃত হয়েছিল?
১০. খিঁচুনির শারীরবৃত্তীয় কারণ কী?
১১. স্ট্যাটাস এপিলেপটিকাস-এ প্রথমেই কোন্ ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়?
১২. মৃগীরোগীর প্রধানত কী কী শতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন?

উত্তর :

১. নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছাড়া দু'বার খিঁচুনির ঘটনা।
২. না।
৩. ইইজি বা ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রাফি।
৪. 'অনুপস্থিতি মৃগী'তে খিঁচুনি হয় না, কিন্তু খুব অল্প সময়ের জন্য শিশু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।
৫. ৩০ মিনিটের বেশি সময় ধরে বারংবার খিঁচুনি হলে এ অবস্থা হয়।
৬. ওষুধ বন্ধ করার পর এক বছর যদি কোনো খিঁচুনি না হয় তা হলে গাড়ি চালাতে পারে।
৭. ঘুমের অভাব।
৮. গুরু মৃগী (গ্র্যান্ড মল এপিলেপসি)।
৯. খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ শতাব্দীতে। হিপোক্রেটিস বর্ণনা করেছিলেন।
১০. মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক তড়িৎ প্রক্রিয়া।
১১. শিরাতে ডায়াজিপাম ইঞ্জেকশন।
১২. গাড়ি চালানো, আগুনের কাছে যাওয়া, সাঁতার কাটা থেকে বিরত থাকা।

ডা. সরিতা তোসনিওয়ালের কাছে খোলা চিঠি ...
অথবা
কত হাজার মরলে পরে বলবে তুমি শেষে...

বিজয়া করসোম

A CARD
Mrs. Gangulee, BA
(45/5 Beniatola Lane, College Square North East Corner, Calcutta) Having studied in the Medical College for five years and obtained a college deploma to practise MEDICINE, SURGERY and MIDWIFERY has commenced parctice and treats WOMEN AND CHILDREN.

Consultation fee for poor patients at her home between 2 and 3 daily.

সাল ১৮৮৮। *বেঙ্গলি* কাগজে এই বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল। পরে বিজ্ঞাপনের ভাষা আরও বদলে যায় :

MRS GANGULI
B A GMCB
Medical Practitioner
Can be consulted at her residence 57 Sukia Street, Calcutta where she has now removed, term moderate.

কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখে অনেকেই অসন্তুষ্ট। *বঙ্গবাসী* পত্রিকাগোষ্ঠী তাঁর উদ্দেশ্যে খুব অপমানজনক কটুক্তি করেন। স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতি কটাক্ষ করে তাঁরা সরাসরি কাদম্বিনীকে বললেন চরিত্রহীনা। মহিলা ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ নতুন কিছু নয়। বিলাতে লেডি ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বলা হত, 'নাইদার এ লেডি নর এ ডক্টর'। তা হলে তাঁরা কী? হয় ছিটগ্রস্ত, নয় চরিত্রহীনা। কিন্তু পাঁচ সন্তানের জননী কাদম্বিনীর এ অপমান সহ্য করলেন না তাঁর স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। তিনি *বঙ্গবাসী* গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক *বঙ্গনিবাসী*-র সম্পাদক মহেশচন্দ্র পালের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করলেন। মামলায় দ্বারকানাথ জয়ী হন এবং মহেশচন্দ্র পালের হয় ১০০ টাকা জরিমানা ও ছয় মাস কারাদন্ড।

ডা. সরিতা তাসনিওয়াল, আপনি নিশ্চয়ই জানতেন তাঁকে। তিনি হলেন কাদম্বিনী গাঙ্গুলী। ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তার। তিনি যখন ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন, তখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার সুযোগ ছিল না। তাই, সবার আগে দেশীয় মেয়েদের মধ্যে যে মেয়েটি মেডিক্যাল পড়ার জন্য মাদ্রাজে যাত্রা করলেন, তিনি দুর্গামোহন দাসের মেজো মেয়ে অবলা দাস। তাঁকে একটা চিঠি লিখেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তাতে লিখেছিলেন, '... মধ্যে মধ্যে এখানকার বন্ধুদের জন্য মন কেমন করিবে কিন্তু তখন আপনার কর্তব্য ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাকে উৎসাহিত করিবে।' অবলার পড়ার মধ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় লক্ষ করেছিলেন শিবনাথ। অবলার পড়া শেষ পর্যন্ত শেষ হয়নি কিন্তু ভারতীয় মেয়েদের মেডিক্যাল পড়ার সূচনা তিনিই করেছিলেন। ভারতীয় মহিলা চিকিৎসকদের পথিকৃৎ বলে আরও যাঁদের নাম জানা যায় তাঁরা হলেন আনন্দিবাঈ যোশী এবং অ্যানি জগন্নাথন। আনন্দিবাঈ-এর জীবনকাহিনী খুব কষ্টের ও সংগ্রামের। বিদেশ থেকে ডাক্তারি পড়া শেষ করে তিনি এদেশে যখন এলেন, তখন তিনি যক্ষ্মারোগে ভুগছিলেন। তিনি জানতেন, এ রোগ থেকে তাঁর মুক্তি নেই। আনন্দির বিশ্বাস ছিল পুনের বিখ্যাত বৈদ্য মেহেনদালের ওপর। এক সময়ে তিনি ছিলেন আনন্দির পিতৃ-পরিবারের গৃহচিকিৎসক। তাঁর কাছে গেলেন আনন্দি। মেহেনদালে তাঁকে কোনো ওষুধ না দিয়ে তাড়িয়েই দিলেন। অপরাধ? আনন্দি কালাপানি পার হয়েছেন। আর তিনি মহিলা হয়ে ডাক্তারি পড়েছেন। অসুস্থ আনন্দি কোলাপুর হাসপাতালে ভর্তি হলেন (যেখানে তিনি ডাক্তার হিসাবে কাজ করছিলেন) কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা কেউ তাঁর ধারও ঘেঁষলেন না। ১৮৮৭-তে নিভে গেল তাঁর জীবনদীপ। অ্যানি জগন্নাথন সম্বন্ধে বিশদ কিছু জানা যায় না। তাই কাদম্বিনীকেই বলা যায় ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক, যিনি রোগীর চিকিৎসা করতে নিজের নামে বিজ্ঞাপন পর্যন্ত দিয়েছিলেন। সেই কাদম্বিনীকে কী সব অভিজ্ঞতার মাঝখান দিয়ে যেতে হয়েছিল, এর একটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। বলছেন চিত্রা দেব তাঁর *মহিলা ডাক্তার ভিন গ্রহের বাসিন্দা* বইয়ে :

এক ধনী পরিবারে বধূর প্রথম সন্তান হওয়ার সময়ে ধাত্রীরা যখন প্রসূতি ও সন্তানের প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন সেই পরিবারে কাদম্বিনীকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নগেন্দ্রবালাকে (একজন নার্স) সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান এবং তাঁদের চেষ্টায় মা ও শিশু দুজনেই রক্ষা পায়। কাদম্বিনী ও নগেন্দ্রবালা তারপর স্নানটান করে এসে দেখলেন ভিতরবাড়ির উঠোনের পাশের বারান্দায়, যেখানে ঝি-রা খেত, সেখানে তাঁদের জায়গা করা হয়েছে। ঠাকুর পরিবেশন করল। কিন্তু খেয়ে ওঠার পর বাড়ির গিন্নি ঝিকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'দাইরা

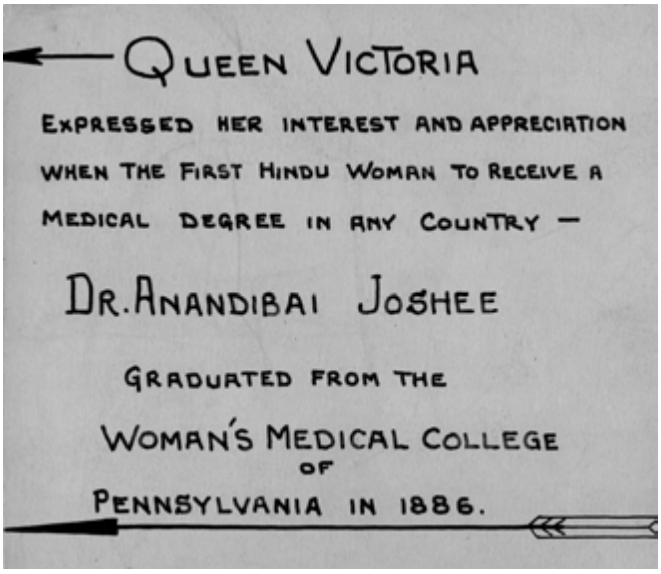

যেন নিজেদের কলাপাতা তুলে ফেলে দিয়ে জায়গাটা মুছে দিয়ে যায়। ঝিরা ওসব নোংরা কাজ করবে না।' অর্থাৎ বিলাতফেরত ডাক্তার কাদম্বিনীর খাওয়ার জায়গা পরিষ্কার করা ছিল এতই নোংরা কাজ যে বাড়ির ঝি-রা পর্যন্ত সে কাজ করতে পারবে না।

খ

এ শুধু আমাদের দেশের কথা নয়। ইউরোপ, আমেরিকায় পর্যন্ত মেয়েদের চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করার অধিকার ছিল না। কানাডার প্রথম মহিলা ডাক্তার এমিলি স্টো-কেও তাঁর নিজেদের দেশ মেডিক্যাল পড়তে দিতে রাজি হয়নি। তিনি নিউ ইয়র্কের মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ডিগ্রি পান, কিন্তু ১৮৬৭ সালে কানাডায় ফিরে এলে তাঁকে মেডিক্যাল প্র্যাকটিস করার লাইসেন্স দেওয়া হয়নি ১৮৮০ সাল পর্যন্ত। ফ্রান্সে মহিলাদের অতিরিক্ত গর্ভপাত করানোর প্রবণতাকে লাগাম পরাবার জন্য ১৭৭৫ সালে নারীদের চিকিৎসা করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকী তাঁদের হাড় জোড়া, দাঁত তোলাও বন্ধ হয়ে যায়। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবাগের অ্যাকাডেমি অব মেডিসিনে ১৮৬১ সালে অনেক মেয়ে পড়তে এসেছিলেন কিন্তু মাত্র একজনকে ভর্তি করা হয়। তিনি ছিলেন রুদানেভা। এসেছিলেন মুসলিম কসাকদের স্কলারশিপ নিয়ে, তাই তাঁকে বহিষ্কার করার আইনগত বাধা ছিল। বাকিদের অপরাধ: তাঁরা মেয়ে। রাশিয়ার মেয়েরা তখন অন্য দেশে গিয়ে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেন। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত মেয়েরা মেডিক্যাল পড়ার সুযোগ পাননি। ইউরোপে মেডিক্যাল কলেজগুলোর দরজা মেয়েদের জন্য ১৮৭০-এর পর থেকে পুরোপুরি খুলে দেওয়ার অন্যতম কৃতিত্বের অংশীদার হলেন সোফিয়া জেক্সব্লেক।

গ

মেরি শেরলিব আধুনিক বিশ্বের প্রথম মহিলা ডাক্তার। ভারতের প্রথম মেডিক্যাল ছাত্রীও তিনি। ১৮৬৬ সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন ব্যারিস্টার স্বামীর সঙ্গে। এখানে এসে মেয়েদের জীবনের করুণ কাহিনি শুনে তিনি ডাক্তার

হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কাজটা সহজ ছিল না। ইউরোপ, আমেরিকা সর্বত্র মহিলারা চিকিৎসক হতে গিয়ে বাধা পাচ্ছেন। শোনা যায়, দু'চারজন সাহসী মেয়ে চিকিৎসা করতেন পুরুষের ছদ্মবেশে। মেরির উৎসাহ ছিল সাংঘাতিক। তাঁকে আরও সাহস জোগালেন ডা. ই বেলফোর। মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে মেরি ও তাঁর তিন সহপাঠিনীর জন্য দরজা খোলা হল। অধ্যাপকেরা সবাই ছিলেন এর বিপক্ষে। মেরি হাল ছাড়লেন না। তাঁকে কেবল ধাত্রীবিদ্যা শেখার অনুমতি দেওয়া হল। বই পড়ার পর তাঁর মনে হল হাসপাতালে গিয়ে কাজ শেখা দরকার। ডা. বেলফোর তাঁকে অধ্যাপক মেজর ককরিলের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। মেজর প্রথমে মেরির প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিলেন। পরে ভয় দেখাতে লাগলেন অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনার সামনে পড়তে হবে বলে। না, তবু মেরিকে আটকাতে পারলেন না। এবারে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লেন মেজর : আপনার স্বামী নিশ্চয় আপনারও কাজে অনুমতি দেবেন না। মেরি জানালেন, তাঁর স্বামীর এতে সমর্থন আছে। অবাক হলেন মেজর : এমন স্বামীও আজকাল আছে যে স্ত্রীকে ডাক্তারি পড়ায় সাহস জোগায়! পরে মেজর বললেন, আমি যে রোগীকে দেখতে বলব, তাকেই দেখবেন তো? রাজি মেরি। ১৮৭১ সাল। বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব চলছে। মেজর ভেবেছিলেন ছোঁয়াচে বসন্ত রোগের ধার ঘেঁষতে চাইবেন না মেরি। কিন্তু মেরি বুঝেছিলেন, মেজরের কথায় রাজি না হলে তাঁর মেডিক্যাল পড়া হবে না। এতে আরও অনেক মেয়ের ডাক্তারি পড়ার সুযোগও পিছিয়ে যাবে। তিনি মেজরের কথায় রাজি হলেন। কিন্তু মেজর তাঁকে হাতে কলমে কিছুই শেখালেন না। তখন হাসপাতালের মেট্রন ছিলে মিসেস সেক্লুনা। ১৫টি সন্তানের জননী তিনি। মেরি তাঁর কাছে কাজ শিখতে শুরু করলেন। ধাত্রী বিদ্যার পর মেরি পড়লেন ডাক্তারি, ১৮৭৫ সালে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের পড়াবার প্রস্তাব উঠেছিল ওই সময়েই।

মহারানি ভিক্টোরিয়া প্রথমদিকে মেয়েদের ডাক্তার হওয়া মোটেই পছন্দ করতেন না। পান্নার মহারানি, মিশনারী চিকিৎসক বিলবির হাত দিয়ে একটা

সোনার লকেট ভারতেশ্বরীকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। আসলে সোনার লকেটটা ছিল একটা চিঠি। তাতে ভারতীয় নারীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা, বিশেষ করে মহিলা চিকিৎসকের অভাবের কথা জানিয়ে সুব্যবস্থার জন্য আর্জি জানানো হয়েছিল। ওই একই সময়ে মহারানির সঙ্গে মেরির দেখা হয়। ভিক্টোরিয়া তখন মহিলা চিকিৎসকের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁর উৎসাহ ও সাহায্যে এদেশের মেয়েদের জন্য মেডিক্যাল কলেজগুলোর দরজা খুলতে শুরু করে।

ঘ

ভারতে রোগ ও রোগ মুক্তির ব্যাপারটাকে সে সময়ে ভৌতিক বা দৈব ঘটনা বলে মনে করা হত। ভারতীয় পুরুষেরা মেয়েদের চিকিৎসা ডাক্তার কবিরাজদের দিয়ে করাতে চাইতেন না অন্দরমহলের আব্রু রক্ষার তাগিদে। যুবক চিকিৎসকদের অন্তঃপুরে ঢোকা নিষেধ ছিল। প্রসব সংক্রান্ত ব্যাপারে ধাত্রীরাই সাহায্য করতেন। ধনী পরিবারে পারিবারিক চিকিৎসকরা দাসীর কাছে রোগের বিবরণ শুনে বাড়ির কোনো মহিলাকে চিকিৎসা করতেন। বিশ শতকের গোড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন। তিনি লিখেছিলেন : অসুখ হলে ডাক্তার দেখানো এক বিপদ ছিল। যদি কারও বেশি অসুখ হত, হার্ট কিংবা লাংস পরীক্ষা করতে হত, তা হলে রোগীর শয্যার ওপর মশারি টাঙানো হত। সেই মশারির ওপর মোটা চাদর দিয়ে চার পাশে ভালো করে ঢেকে দিত। ডাক্তার এসে বসত শয্যার পাশে একটা চেয়ার নিয়ে। রোগী মশারি থেকে হাত বের করে দিত না। ডাক্তার মশারির ভেতর হাত দিয়ে রোগীর হাতের কবজির নাড়ি পরীক্ষা করত। বুক পিঠ কল দিয়ে পরীক্ষা করতে হলে আমাদের ভাইদের কেউ গিয়ে মশারির ভিতর বসত। ডাক্তারের কানে থাকত কল, আর কলের এক দিক মশারির ভিতর পাঠিয়ে দিত। রবারের নলে মশারির চাদরের ঘষায় আর অনভ্যস্ত হাতের কল বসানোতে ডাক্তার যতটা যা বুঝতে পারত, তাতেই ওষুধ দিত। আয়ু থাকলে বাঁচত—না হয় মরত। আমার মা-নানিরা বলাবলি করতেন, মেয়েদের মানসম্মানের সঙ্গে মরাই তো ভালো। যাক জান — থাক মান।

ভাগলপুরের এক মহিলা চিকিৎসক মিস শরৎকুমারী মিত্র বেগম রোকেয়াকে তাঁর এরকম এক অভিজ্ঞতা শুনিয়েছিলেন। শহর থেকে চার ক্রোশ দূরে এক রোগিনীকে দেখবার জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছিল। সংবাদ বাহক তাঁকে ডাকতে এসে বলল, 'বউ বেগমের দাঁতে ব্যথা হচ্ছে।' তিনি দাঁত তোলার সরঞ্জাম নিয়ে রোগিনী দেখতে এসে অবাক হয়ে দেখলেন, দাঁতের ব্যথা নয়, প্রসব বেদনায় রোগিনী কাতর। তিনি বাড়ির কর্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে মিথ্যা কথা বলে ডেকে আনা হল কেন? উত্তর পেলেন, 'পুরুষ চাকরের দ্বারা ডাক্তারনিকে ডাকিতে হইল, সুতরাং তাকে দাঁতে ব্যথা না বলিয়া আর কী বলিতাম? তোবা ছিয়া মর্দুয়াকে ও কথা বলিতাম কী করিয়া? আপনি কেমন ডাক্তারনি যে লোকের কথা বুঝেন না?'

ডা. সরিতা তোসনিওয়াল

ঙ

স্বাধীনতার পর এদেশের মহিলারা যখন বিদ্যাশিক্ষার অধিকার পেলেন তখন থেকেই ধীরে ধীরে মহিলা চিকিৎসক হওয়ার বাধা দূর হতে থাকে। মেয়েরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হন এবং প্রায় সবকটা মেডিক্যাল কলেজে মেয়েরা ভর্তি হতে থাকেন। বিশ্বায়ন বা উদারীকরণ, মানবীবিদ্যার চর্চা ও প্রসার, আণবিক পরিবারের জন্ম ইত্যাদির পর মেয়েরা আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হওয়ার জন্যও ডাক্তারি-শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকলেন। আজকাল 'বিজ্ঞান' নিয়ে পড়াশোনা করা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। গত কয়েক বছর ধরে পড়াশোনার খরচ মারাত্মক বেড়ে গেছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের মাধ্যমিকের পর বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে থাকলেও খরচের কথা ভেবে আর সে পথে এগোবার ভরসা পান না। এখন, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে, একমাত্র ধনী পরিবারের মেয়েরা চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন। তাই, ডাক্তারিতে মেয়েদের সংখ্যা যে খুব দ্রুত হারে বাড়ছে, তা নয়। ১৯৭১ সালে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল বাইশ শতাংশ। (সূত্র : 'টুওয়ার্ডস ইকোয়ালিটি', *রিপোর্ট অব দ্য স্টেটাস অব উইমেন ইন ইন্ডিয়া*, সমাজকল্যাণ মন্ত্রক)। আর একুশ শতকের গোড়ার দিকেও দেখা যাচ্ছে, 'এইমস'-এ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট মেয়েদের ভর্তির অনুপাত বছরে ২০-২২ শতাংশ। (সূত্র : মমতা সুদ, 'উইমেন ফিজিশিয়ান্স ইন ইন্ডিয়া', *দ্য ন্যাশনাল মেডিক্যাল জার্নাল অব ইন্ডিয়া*। আরও যেটা ভাবায়, তা হল ডাক্তারির মধ্যে মেয়েদের পছন্দের বিষয়। কাদম্বিনী গাইনোকলজি বেছে নিয়েছিলেন, প্রথম মহিলা ডাক্তার হিসেবে তাঁর পছন্দ বিস্মিত করে না। কিন্তু আজও এটাই মেয়েদের প্রধান পছন্দ। আর পছন্দ প্যাথোলজি মাইক্রোবায়োলজি- পেডিয়াট্রিকস্। সার্জারিতে তো মেয়েরা নেই-ই। হাড়ের অস্ত্রোপচার তো প্রায় কেউ করেন না। 'এইমস'-এ ২০০৮ সালের সমীক্ষাটা থেকে দেখা যাচ্ছে, নিউরোসার্জারি, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সার্জারি, অনকোসার্জারিতে একজনও মহিলা নেই। ফরেনসিক মেডিসিন, নেফ্রলজি, নিউক্লিয়ার মেডিসিন, সবই প্রায় স্ত্রী শূন্য। গাইনোকলজির বাইরে তাদের পছন্দ অ্যানেস্থেশিয়া, শিশুদের চিকিৎসা, চোখের চিকিৎসা, চামড়ার চিকিৎসা, সাইকিয়াট্রি। বেশ কিছু মেয়ে সরাসরি চিকিৎসামূলক বিষয় থেকে সরে রেডিয়োলজি, প্যাথোলজি, কমিউনিটি মেডিসিন বেছে নেন। সংসার এবং কাজের চাপ সামলাতে মেয়েরা পেশার এমন একটা জায়গা বেছে নেন, যেখানে কাজের একটা নির্দিষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে। অনিশ্চয়তা কম। ক্রিটিক্যাল মেডিসিন, ট্রমা মেডিসিন মেয়েরা তাই এড়িয়ে যান, ইমার্জেন্সি ডিউটি করতে চান না।

তফাত রয়েছে কেরিয়ার গড়নেও। 'মধ্য চল্লিশে পুরুষরা যখন কেরিয়ারকে শীর্ষে তোলার চেষ্টা চালান, মেয়েরা তখন একটা সুস্থির, সমতল খোঁজেন অর্থাৎ সংসার-সন্তান-সন্তানের কেরিয়ার।' বললেন একটা বড়ো হাসপাতালের মেডিক্যাল ডিরেক্টর। অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করে ডাক্তার হয়েও অনেকে সংসার ছেলেমেয়ে বড়ো করা, ডাক্তার স্বামীকে খাইয়ে দাইয়ে চেম্বারে পৌঁছে দেওয়া বেশি পছন্দ করেন। নিজে ডাক্তারিকে পেশা হিসাবে নেন না। যেমন অঞ্জলি তেন্ডুলকর। অসম্ভব কৃতি ছাত্রী ছিলেন। রেকর্ড মার্কস নিয়ে মেডিসিনে হয়েছিলেন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কিন্তু স্বামী যাতে ক্রিকেটে পুরো মন দিতে পারেন, তাই ডাক্তারি করলেনই না। সচিনের অবসর নেওয়ার পর আবার কি পেশায় ফেরত যাবেন? সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরে অঞ্জলি বলেন— 'তার কী মানে হবে? এতদিন ও বাড়িতে থাকত না। আমি সামলাতাম। এখন ওকে বাড়িতে রেখে আমি বেরিয়ে যাব? হয় নাকি?' বিশেষজ্ঞদের মতে, মহিলা ডাক্তারদের এই প্রবণতা খুবই ক্ষতিকর। সমাজের জন্য, দেশের জন্য। এটা মানব-সম্পদের অপচয়।

চ

বিখ্যাত চিকিৎসকদের প্রায় সকলেই পুরুষ। নারীর যন্ত্রণা মোচনে তাঁদের চিন্তাও চেষ্টার কথা সুবিদিত। তবুও আমাদের দেশে মহিলা চিকিৎসকদের প্রয়োজন খুব বেশি। এখনও এ দেশের মহিলাদের সম্বন্ধে মনে করা হয়, 'মেয়েদের কলজের জোর বেশি।' তাই মেয়েদের অসুখ হলে ডাক্তার দেখানোতে অনেক দেরি করা হয়। মেয়েরা আবার পুরুষ ডাক্তারদের কাছে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে চান না। চিরাচরিত সামাজিক অনুশাসনে বন্দি তাঁরা। এছাড়া প্রসবকালীন যন্ত্রণা বা ওই সংক্রান্ত কথা কীভাবে পুরুষদের বলা যায়, এমন এক মনোভাব ২০১৪ সালেও অনেকের মধ্যে রয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েরা এক সময় পুরুষ চিকিৎসকদের এড়িয়ে চলতেন। তাঁরা নির্ভর করতেন জড়িবুটি ওষুধদাত্রী মহিলাদের ওপর। শোনা যায়, রবীন্দ্রজননী সারদাদেবীর মৃত্যু হয়েছিল হাতুড়ে চিকিৎসার ফলে।

তাই দেশে মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজন খুব বেশি। শিশুমৃত্যু, নাবালিকা-সাবালিকা মায়ের মৃত্যু, অপুষ্টি, অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দেওয়া ইত্যাদিতে এদেশ বিশ্বের মধ্যে এগিয়ে আছে। মেয়েরা নিজেদের সমস্যার কথা মহিলা ডাক্তারদের বলতে পারলে শুধু স্বস্তি পেতেন তাই নয়। প্রাণেও বাঁচতেন। 'মেয়েরা সুস্থ, নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়নে সমান সুযোগ পেলে পরিবার, সমাজ এবং জাতির সমৃদ্ধি আনতে পারে' বলে জানান মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরি। ঠিক ওই সময়ে আপনার চলে যাওয়ায় এক বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল ডা. সরিতা তোসনিওয়াল। ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ এখনও মেয়েদের পূর্ণ মানুষ বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। ঘরের মেয়েকে কোনো মতে গ্র্যাজুয়েশন করিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে চায়। একজন মেয়েকে ডাক্তারি পড়ানো ব্যয় এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ডা. সরিতা, আপনি জানেন, আজকাল অনেকেই ডাক্তারি পাশ করে প্রাইভেট চেম্বার-ফ্ল্যাট-গাড়ি বিদেশভ্রমণ ইত্যাদি নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন। তবু আমরা চাই আপনাদের মতো মেয়েরা বেশি বেশি করে ডাক্তারি পড়ুন। তাঁরা যেন ব্যক্তিস্বার্থের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ান এবং রোগাক্রান্ত মানুষের বিশেষ করে মহিলাদের কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন।

লেখক পরিচিতি : বিজয়া করসোম, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক

সম্পাদকীয় সংযোজন : ডা. সরিতা তোসনিওয়াল, আসাম মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠরতা ছাত্রী ছিলেন। ৯ মে ২০১৪ তারিখে তাঁকে তাঁর হাসপাতালের আইসিইউ-এর মধ্যে হত্যা করা হয়।

advt.

অনীক

'অনীক' পত্রিকা ৫০ বছর পেরিয়েছে। এই দীর্ঘ সময় ধরে অনীক চেষ্টা করেছে সমসাময়িক গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন গণ-আন্দোলনের চলমান দর্পণও বটে। কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও, সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকে সমকালীন রাজনীতি-অর্থনীতি ও সামাজিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে— রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ ছাড়াও গল্প-কবিতা-নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১৫০ টাকা (সডাক)
অনীক, প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি। ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০০০৯
ফোন—৯৪৩২৮৭৭৫৬০/৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২

রান্নাঘরে মারণ ফাঁদ

দূষণ বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে রাস্তার গাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানার বর্জ্য এবং হয়তো বা কীটনাশক, আর্সেনিক, ডিডিটি ইত্যাদি। আমাদের বাড়ির ভেতরে প্রতিদিন ঘটে চলা বাড়ির দূষণ আমাদের ভাবনা বা আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে না। অথচ পরিবেশ দূষণে মৃত্যুর অর্ধেকই ঘটে ঘরের ভিতরের দূষণ থেকে আর তার প্রধান শিকার মেয়েরা— লিখছেন **মিলন দত্ত**।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) গত বারের মার্চ মাসে তার যে সর্বশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করে, সেখানে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে গোটা বিশ্বে পরিবেশ দূষণের কারণে মোট ৭০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। পৃথিবীতে যত মৃত্যু ঘটছে তার আট জনে এক জনের মৃত্যু হচ্ছে পরিবেশ দূষণের কারণে। আর ওই মৃত্যুর অর্ধেকেরও বেশি (৪৩ লক্ষ) ঘটছে ঘরের ভিতরের দূষণ থেকে। কয়লা এবং বিচালি, ঘুঁটে, ডালপাতা, কয়লা, কাঠ, পাটকাঠি, পাটের ফেঁসো আর কাঠকয়লা (এই জ্বালানিকে পরিভাষায় বলে বায়োমাস বা সলিড ফুয়েল) পুড়িয়ে রান্নার জেরে এই সব মৃত্যু। অর্থাৎ পরিবেশ দূষণে এখনও সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত মহিলারাই। ১৯৯৭ সালে 'এনার্জি অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর একটা সমীক্ষা থেকে জানতে পারি, ওই বছর ভারতে বায়ু দূষণের শিকার হয়ে মৃত্যু হয়েছিল ২৫ লক্ষ মানুষের। তার মধ্যে বাইরের দূষণ যেমন ছিল, ঘরের ভিতরের দূষণও ছিল। তার মধ্যে বেশির ভাগ মৃত্যুই হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে রান্না করার জন্য নিম্ন মানের জ্বালানি ব্যবহার করার ফলে। এ ক্ষেত্রেও দূষণের সিংহভাগ শিকার কিন্তু সেই মেয়েরাই। ঘুঁটে বা কাঠ পুড়িয়ে রান্না করা সময় ফুসফুসে বিষ ধোঁয়া তো ঢুকছেই, ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে অতিসূক্ষ্ম ছাই বা কণা, যা ফুসফুসে স্থায়ী বাসা বেঁধে মারণ রোগের সৃষ্টি করে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েরাই তার শিকার। এতে সব চেয়ে ক্ষতি হয় প্রসুতিদের। তাঁর গর্ভস্থ বাচ্চার স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যায়।

২০১৪ সালের অগস্ট মাসে 'এনভায়রনমেন্টাল হেলথ পার্সপেকটিভ'-এ প্রকাশিত একটা সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে, ঘুঁটে, কাঠ, কয়লা বা গ্যাসের উনুন— যাতেই রান্না করুন কোনোটাই নিরাপদ নয়। দু'ধরনের জ্বালানির ধোঁয়া থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে বিষ গ্যাস এবং রাসায়নিক নির্গত হয়। সেই বিষের তালিকায় রয়েছে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, অতি সূক্ষ্ম কণা এবং ফর্মালডিহাইড। গোটা বিশ্বে ৩০০ কোটি পরিবার এই ঘরোয়া দূষণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ওই সমীক্ষার একটা তথ্য আমাদের কিছুটা স্বস্তি দিতে পারে, কেবল গরিব দেশে নয় ধনী দেশের মানুষও এই বিষ থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। আমেরিকার মতো ধনী দেশেও পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ মানুষ ঘরোয়া দূষণের শিকার। মূলত গরিব মানুষেরা 'সেফফুয়েল' ব্যবহার করতে পারেন না বা তাঁদের রান্নাঘরও ধোঁয়ামুক্ত নয়।

কী রোগ, কাদের রোগ?

ঘুঁটে, পাটকাঠি বা কাঠের জ্বালানি ব্যবহার করে যাঁরা রান্না করেন, তাঁদের মধ্যে ফুসফুসের টিবির প্রভাব দেখতে ১৯৯২-৯৩ সালে জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষায় গোটা দেশে ২ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দেখা যায় কুড়ি বছর বা তার বেশি বয়স্ক মহিলাদের ৫১ শতাংশ ফুসফুসের টিবিতে আক্রান্ত। রান্নাঘরের ধোঁয়ার দূষণের সঙ্গে কম ওজনের শিশু জন্মানোর (Low Birth Weight) গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পুষ্টির ঘাটতি রয়েছে এমন প্রসূতিদের জন্য সেই বিপদের ঝুঁকি আরও অনেক বেশি। সে ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যু এবং মৃত শিশুর জন্ম দেওয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে। আমেদাবাদের একটা সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গর্ভাবস্থায় যে প্রসূতিরা ঘুঁটে বা কাঠের জ্বালানিতে রান্না করেন, তাঁদের মধ্যে মৃত শিশু জন্ম দেওয়ার সম্ভাবনা ৫০ শতাংশ বেশি। গুয়াতেমালার গ্রামে দেখা গেছে, যে প্রসূতিরা গ্যাস বা বিদ্যুতের চুল্লিতে রান্না করেন, তাঁদের তুলনায় কাঠের উনুনে রান্না করেন এমন প্রসূতিদের বাচ্চা জন্মায় গড়ে অন্তত ৩৬ গ্রাম কম ওজন নিয়ে।

রান্নাঘরের বিষ ধোঁয়ার কারণে প্রতি বছর পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রচুর শিশুর মৃত্যু হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা তথ্য জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। তা হল ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও চিন দেশে যত মহিলা ফুসফুসের ক্যানসারে ভুগছেন, তাদের দুই-তৃতীয়াংশেরই ফুসফুসে ক্যানসারের কারণ এই বিষ ধোঁয়া। যত শিশু ম্যালেরিয়া বা এইডস রোগের বলি হয়, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক মারা যায় বিষ ধোঁয়ার কারণে রোগে ভুগে। রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর এবং বাইরের বাতাসকে দূষিত করে এই ধোঁয়া। ক্যানসারের চাইতে অনেক বেশি সংখ্যায় হয় নানা সংক্রমণ, মূলত ফুসফুসে সংক্রমণ। প্রতি বছরই বিষ ধোঁয়ার রোগে ভুগে মৃতের অর্ধেকেরই বেশি শিশু। মারা যান বহু পুরুষও। প্রতিষেধক না নেওয়ার কারণে ম্যালেরিয়ায় যত না মারা যায়, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক মৃত্যু হয় ঘরের মধ্যে রান্নাবান্নার ধোঁয়ার মতো বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায়, পোকামাকড় মারা বা তাড়ানোর জন্য যেসব রাসায়নিক ব্যবহার হয় সেসব রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে পরিবেশ দূষণের পরিণতিতে। ফলে 'ইনডোর এয়ার পলিউশনে'র কবলে পড়ে, অর্থাৎ ঘরের মধ্যের বায়ুদূষণে বছরে পাঁচ বছরের কম বয়সী লাখেরও বেশি শিশু-মৃত্যু হয়। 'অ্যাকিউট লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন' (শ্বাসযন্ত্রের নিম্নাংশের প্রবল সংক্রমণ) রোধে বাড়ির পরিবেশ কী ধরনের হওয়া উচিত সে সম্পর্কিত প্রচারের কোনো ব্যবস্থা

নেই। গরিব দেশের মানুষ, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের মানুষ চাইলেই ভাত, তরকারি রান্নার জন্য সস্তার জ্বালানি বাদ দিতে পারবেন না। একজন মা দিনে সাধারণত তিন থেকে সাত ঘণ্টা রান্নাঘরে থাকেন। যিনি যত সময় বেশি রান্না ঘরে থাকছেন, তিনি নিজেকে ও তাঁর পরিবারকে তত বেশি উত্তাপ এবং বিষধোঁয়া উপহার দিচ্ছেন।

পাঁচ বছরের কম বয়সীদের ওপর এই বিষধোঁয়ার আক্রমণের প্রভাব দ্রুত হয়। প্রথমত, ওই বয়সটায় সে বেশির ভাগ সময় মায়ের গায়ে গায়ে সেঁটে থাকতে ভালোবাসে। সোজা কথা, শিশুরা মায়ের সংস্পর্শ ছাড়া থাকতে চায় না। এ বয়সে শিশুদের শ্বাসনালী থাকে চাপা, সরু ও কচি। তার ওপর বিষধোঁয়ায় প্রদাহ সেটাকে বিধ্বস্ত করে। দ্বিতীয়ত, শিশুদের ফুসফুস এ সময় পরিণত হয় না। পাশাপাশি শিশুরা দ্রুত শ্বাস নেয়। ফলে দূষিত পদার্থ শিশু অতি দ্রুত আত্মস্থ করে। আর অপুষ্টির কারণে যেসব শিশুর দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের ক্ষতি হয় আরও বেশি। প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় বাইরের এসব বিষ শরীরে একবার ঢুকে পড়লে দীর্ঘ সময় ধরে ডেরা বেঁধে থাকে।

অর্থনীতি, স্বাধিকার

এ দেশে বহু জায়গায় এখনও জ্বালানির কাঠ কুড়োতে জঙ্গল যেতে-আসতে ২ থেকে ৪ কিলোমিটার পথ যাতায়াত করতে হয় পিঠে কাঠের বোঝা নিয়ে। এই ধকলের পর এক জন মহিলা যখন কাঠ পুড়িয়ে রান্না বসায়, তখন তার শরীর থাকে ক্লান্ত-অবসন্ন। শরীরের ভালো না খারাপ কী হচ্ছে তা বোঝার মতো সময় কোথায়? শুধু মায়েরাই নন, ওই সব পরিবারের মেয়েদেরও স্কুল বাদ দিয়ে কাঠ কুড়াতে যেতে হয়। আমাদের দেশে অনেক জায়গাতেই স্রেফ রান্নার কাঠ জোগাড়ে বেরিয়ে লাখ লাখ মেয়ের যে শ্রম এবং সময়ের অপচয় প্রতিদিন হয়, সে শ্রম বিনিয়োগে যে পরিমাণ উৎপাদন মিলতে পারত, তা নিয়ে আমাদের ভাবনার সময় নেই। ঘুঁটে, কাঠ, ধান, গম এবং বিভিন্ন গাছগাছড়ার গোড়া পুড়িয়ে রান্না করে কী পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, আমরা জানি না। বিজ্ঞানসম্মতভাবে সে শক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করার কথা ভাবা হয়নি, কারণ এই সম্পর্কিত কোনো পরিসংখ্যান আমাদের কাছে নেই। ঘুঁটে ও কাঠ পুড়িয়ে যে শক্তি তৈরি হয় তা আমাদের কাছে অদৃশ্য শক্তি। এখনও পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি লোক বিচালি, কাঠ, ঘুঁটে, কয়লা এই সব দিয়ে রান্না করে।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রপুঞ্জে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছিল—২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র দূর করার পাশাপাশি শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে এই বিষ দূষণের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কথা। তবে তার জন্য যাঁরা এ ধরনের জ্বালানি ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাঁদের জন্য কুটির শিল্প গড়তে হবে। সেই আয় থেকে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। শিশু ও বালিকাদের কাঠ কুড়ানোর কাজে যাওয়া বন্ধ করে স্কুলে পাঠানোর উদ্যোগ ১০০ শতাংশ সফল করতে হবে। এই শ্রেণির মহিলাদের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এই মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে রান্নার জন্য কী ধরনের বিষ দূষণ ঘটছে তা বোঝাতে হবে। বিকল্প আয়ের পথ করে দিলে কম সময় রান্নাঘরে কাটানো, বিজ্ঞানসম্মত জ্বালানির দিকে ঝুঁকতে এই মহিলারা যে দেরি করবেন না, তা বলাই বাহুল্য। চিমনি স্টোভ, ধোঁয়া নির্গমনের নল লাগানো উনুনের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত অন্তত বছর কুড়ি আগে থেকে গ্রামের রান্নাঘরের উনুনগুলোতে পাইপ যোগ করে ধোঁয়াহীন চুল্লি তৈরির কৌশল শেখানো হয়েছিল। পঞ্চায়েত থেকে কিছু তৈরিও করে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রচার এবং সচেতনতার অভাবে সেই প্রকল্প বেশি দূর এগোয়নি। এলপিজি, কেরোসিন বা জৈব গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতে মায়েদের যত তাড়াতাড়ি উদ্যোগী করা যাবে, ততই মঙ্গল। কারণ বিষ ধোঁয়ার ভয়ানক দূষণ ঘটছে বায়ুমণ্ডলে। তার ফল সবাইকে ভুগতে হচ্ছে। আমরা টের পাচ্ছি না। বিষাক্ত ধোঁয়ায় ফুসফুস ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। আয়ু কমে যায়।

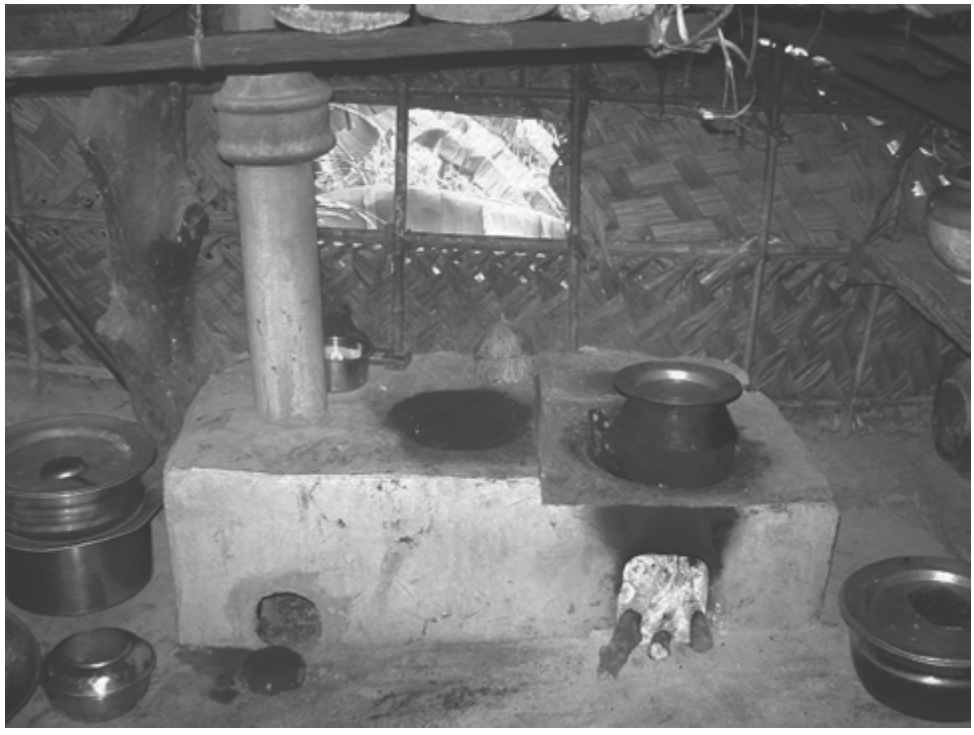

যারা বাজি বানায়, তারাও ভয়ানক দূষণের মধ্যে রয়েছে। বাজি কারখানায় বেশির ভাগ কর্মী শিশু। সেই সব শিশু শ্রমিকদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা, তাদের স্কুলে পাঠানোও নিশ্চিত করতে হবে। এ সবই রাষ্ট্রপুঞ্জের আরও হাজারটা গালভরা প্রস্তাবের মতো ফাইল বন্দি পড়ে রয়েছে।

কিছু গবেষণা

হংকং-এর এক দল বিজ্ঞানী জানাচ্ছেন, রান্নাঘরের দূষণে ৬ বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের অ্যালার্জি, অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস বা এই ধরনের এক বা একাধিক অসুখ হতে পারে। যাদের বাড়িতে দিনে একবার রান্না হয়, তাদের বাড়ির ছোটো ছেলেমেয়েদের ওই রোগগুলোয় আক্রমণের হার ১৯ শতাংশ।

তিনবার রান্না হয় যেসব বাড়িতে, সেসব বাড়িতে এই সব অসুখে আক্রান্তের হার ৪৪ শতাংশ। ছোটোদের মতো বড়োদেরও শ্বাসকষ্টের রোগ হতে পারে। 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এপিডেমিওলজি'তে প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ার একটা গবেষণাপত্র জানিয়েছে, শ্রেণিকক্ষ থেকে গ্যাস হিটার সরিয়ে নেওয়ার পরে দেখা গেল বাচ্চাদের শ্বাসকষ্ট তথা অ্যালার্জিঘটিত রোগের বহর কমেছে। স্কটল্যান্ডের এক গবেষণা প্রতিবেদনে পাওয়া যাচ্ছে, গ্যাসস্টোভের অগ্নিশিখা থেকে যে ধোঁয়া বের হয়, তাতে ফুসফুসে জ্বালা, প্রদাহ হয়। তা হলে দেখা যাচ্ছে গ্যাসের উনুন সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য চিমনি বা একজস্ট ফ্যান অনেকটা স্বস্তি দিতে পারে। যিনি রান্না করছেন, তাকে ধোঁয়ার বিরক্তি তথা ধূম্র-বিষের জ্বালা সইতে হবে না, ঘেমে-নেয়ে একশা হতে হবে না। সচ্ছল মধ্যবিত্ত তার রান্নাঘরে চিমনি বা একজস্ট ফ্যান লাগিয়ে না হয় স্বস্তি পেল। গরিব মানুষের কী হবে?

কীসের সচেতনতা?

সরকারি এবং বেসরকারি ভাবে বলা হয়ে থাকে, রান্নাঘরের বিষধোঁয়ার সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে বেশি কাজ দেয় সচেতনতা। আমাদের দেশে এই নিয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজ হয় না বললেই চলে। কিন্তু গ্রামের গরিব মায়েদের যদি জানিয়ে দেওয়া যায় যে, তাঁর স্বাস্থ্যহানি, রোগ-ভোগ, শিশুর ভোগান্তি বা তার অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী তার কয়লা এবং বিচালি, ঘুঁটে, ডালপাতা, কয়লা, কাঠ, পাটকাঠি, পাটের ফেঁসো বা কাঠকয়লার জ্বালানি, তা হলে তাঁরা কী করতে পারেন? তাঁর কিছুই করার নেই। তাঁর কাছে রান্না করার জন্য বিকল্প কোনো নিরাপদ জ্বালানির জোগান নেই। না আছে গ্যাস না আছে বিদ্যুৎ। এ ছাড়া যে দেশে শতকরা ৩০ পরিবার দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, তাদের জন্য বিকল্প জ্বালানির প্রস্তাব কতটা অবাস্তব তা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ছাড়া এ দেশে অধিকাংশ গরিব বাড়িতে পৃথক রান্নাঘর তৈরি চরম বিলাসিতা বৈ কিছু নয়। সে সাধ্য তাঁদের নেই।

আর একটা বিকল্প ব্যবস্থা হল সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানো। সৌর বিদ্যুতে ঘরে আলো জ্বলবে আর রান্না হবে সৌর উনুনে। তাতে অন্তত বিষ ধোঁয়ার উপদ্রব কমবে। ঘরের চালে ফোটোভোল্টাইক প্যানেল বসিয়ে খুব সহজেই সূর্যের আলো থেকে নিরাপদ শক্তি উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু সরকারিভাবে তেমন কোনো বড়ো উদ্যোগ চোখে পড়ে না। সুন্দরবনের কিছু কিছু গ্রামে সৌর বিদ্যুতের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে তা দিয়ে একটা বা দুটো এলইডি আলো জ্বালানো যায়। সৌর উনুন জনপ্রিয় করার উদ্যোগ দেখা যায় না।

রান্নাঘরে বা ঘরের ভিতরের যে এমন এক ভয়ানক মারণ দূষণ থাবা পেতে বসে আছে, দূষণে যাঁরা আক্রান্ত তাঁরাও জানেন না সে কথা। সেটা জানানোর অন্তত কোনো ব্যবস্থা এখনই করা দরকার। কেন্দ্র বা রাজ্য কোনো সরকারের সে দিকে মন আছে বলে মনে হয় না। কারণ ভোটের বাজারে এই সমস্যার কাটতি নেই। সরকারি উদ্যোগ তো নেই-ই, বেসরকারি কোনো উদ্যোগও দেখতে পাই না।

তথ্য সূত্র :

১. Indoor Air Pollution in India : A Major Environmental and Public Health Concern, ICMR Bulletin, May 2001

২. Indoor smoke from solid fuels : Assessing the environmental burden of disease at national and local levels, WHO, Protection of the Human Environment, Geneva 2004.

৩. 'Silent Threat' by Indu Mathu S, Down to Earth, 1-15 October 2014.

৪. National burden of disease in India from indoor air pollution. Kirk R. Smith, School of Public Health, University of California, Berkeley.

লেখক পরিচিতি : মিলন দত্ত, সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

Advt.

উৎস মানুষ

বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান :

দীপক কুণ্ডু, ২৯/৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২ বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), বইকল্প, ১৮ বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৭০০০৩১।

যোগাযোগ : ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

ফোন- ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

সর্পদংশন

(৩য় পর্ব)

স্বাস্থ্যের বৃত্তে-র দুই সংখ্যায় আমরা সাপের কামড়, সাপের বিষ, বিষক্রিয়ার লক্ষণ ও প্রতিষেধক নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করছি। যেটা আলোচনা হয়নি সেটা খোদ সাপ সম্পর্কেই। সাপ চেনাটা খুবই জরুরি— সেটা আত্মরক্ষার জন্যও বটে আবার প্রাণী সংরক্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকেও বটে–তাই আসুন, আজ আমরা একটু সাপ চেনার চেষ্টা করি— লিখছেন **ডা. শেখ মাসুম**।

বিষধর সাপ, স্বল্প বিষ সাপ, বিষাক্ত সাপ ও নির্বিষ সাপ :

বিষধর সাপ (venomous snake) : এই সাপেদের লালাগ্রন্থিগুলো বিশেষ ভাবে বিবর্তিত হওয়ার ফলে সেগুলো বিষাক্ত কিছু উপাদান ক্ষরণে সক্ষম। এই বিষ কামড়ের মাধ্যমে রক্তে প্রয়োগ করে সাপ তার শিকারকে কাবু করে বা আত্মরক্ষা করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই বিষাক্ত উপকরণগুলো সবই প্রোটিন জাতীয়। এগুলো আপনার রক্তে মিশলে বিষক্রিয়া হবে, মেরেও ফেলতে পারে আপনাকে। অথচ আপনি যদি এই বিষ সাপের লালাগ্রন্থি থেকে বার করে গ্লাসে ঢেলে পান করেন তা হলে সাধারণত আপনার কিছুই হবে না— পেটে বিষাক্ত উপাদানগুলো হজম হয়ে যাবে।

স্বল্প বিষ বা মৃদু বিষ সাপ (Midly venomous snake) : এই সাপ উপরোক্ত সাপেদের মতোই, তফাত শুধু এটুকুই যে এদের বিষের ক্ষমতা খুবই কম, ছোটোখাটো প্রাণীদের (যেমন ইঁদুর) কাবু হয়তো করতে পারবে কিন্তু মানুষের শরীরে প্রায় কোনো প্রভাবই ফেলবে না। প্রকৃষ্ট উদাহরণ লাউডগা।

নির্বিষ সাপ (Non-venomous snake) : এদের লালাগ্রন্থিতে কোনো বিষাক্ত উপাদান ক্ষরিত হয় না। কিন্তু তা বলে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এই সাপগুলোকে অবজ্ঞা ভরে বা অসতর্ক ভাবে নাড়াচাড়া করা যায়— এরা কামড়ালেও বেশ ব্যথা-যন্ত্রণা হতে পারে। যে কোনো বন্য প্রাণীর মতোই সব সাপের মুখেই জীবাণুর পরিমাণ অত্যন্ত বেশি, কামড়ের ক্ষতটি খুব শীঘ্রই সংক্রমিত হয়ে বিশ্রি ঘা-এ রূপান্তরিত হতে পারে। বড়ো সাপের, বিশেষত অজগর বা ময়ালের, চোয়ালে বীভৎস জোর থাকে, কামড়ে ধরলে ছাড়াতে বেশ বেগ পেতে হয়। আর এই সাপগুলো জড়িয়ে ধরলে তো কথাই নেই— নিমেষের মধ্যে পাঁজর ভেঙে ফেলে এরা— মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে। যদি শরীরের কেন্দ্রীয় ভাগে নাও জড়ায়, একটা হাত বা পা শুধু জড়িয়ে ধরে তার হাড় গুঁড়ো করতে বেশি সময় এদের লাগে না। সুতরাং, সমস্ত সাপকেই খুব সাবধানতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করা উচিত, সে বিষধর হোক কি নির্বিষ।

বিষাক্ত সাপ (Poisonous snake) : বিষাক্ত সাপ ও বিষধর সাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কিছু প্রজাতির সাপ বিষাক্ত কুনোব্যাঙ বা বিষাক্ত গোসাপের বাচ্চা খেয়ে, তাদের পাচন করে, তাদের শরীরের বিষ আলাদা করে নিজেদের শরীরে (বিশেষত যকৃৎ-এ) জমা করে রাখে— পরবর্তীকালে যদি কোনো চিল, কাক ইত্যাদি সেই সাপ খায়, তারা বিষক্রিয়ায় মারা যায়। ফলে চিল, শকুন বা কাক, এই সাপগুলো থেকে দূরে থাকে— বিবর্তনের ফলে এটা একটা খুব কার্যকরী আত্মরক্ষার পদ্ধতি হিসাবে ফল দেয়। উদাহরণ : *Ruabdophis* Sp.

বিষধর সাপ : আমাদের দেশে আনুমানিক ২৭২টি প্রজাতির সাপ আছে, যার মধ্যে মাত্র ৫৮টি বিষধর। তাদের মধ্যে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় এমন সাপ হাতে গোনা— ৮-১০টা সাপ চিনলেই কাজ চালানোর মতো জ্ঞান হয়ে যায়।

আমরা আগেই 'Big Four' বা 'তীব্র মহাচার'-এর কথা শুনেছি। এবার এদের এক একটাকে নিয়ে একটু সবিস্তারে কাটাছেঁড়া হোক—

(ক) **গোখুরা- Common Cobra / Spectacled Cobra** (*Naja naja*) : বাংলা নাম 'গোখুরা', হিন্দি নাম 'নাগ'। উত্তরপূর্ব ভারত ছাড়া প্রায় সব রাজ্যেই পাওয়া যায়।

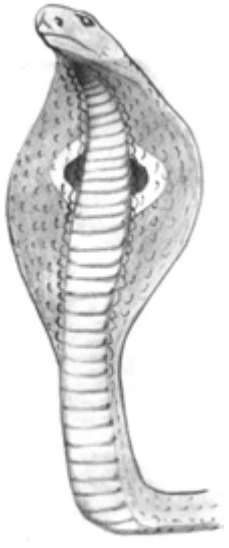

চিত্র—গোখুরা (বা অন্যান্য ফণাধর সাপের) আক্রমণের ভঙ্গিমা। ফণাধর সাপেরা ঘাড়ের কাছের পাঁজরগুলো খাঁচা খোলার মতো দুপাশে ছড়িয়ে দেয় ঘাড়ের ৮টি পেশির সাহায্যে (বক্ষস্থিত অস্থি বা স্টার্নাম না থাকার ফলেই এটি সম্ভব)। এতে সাপটিকে অনেক বড়ো ও ভীতিপ্রদ দেখায়—বাংলায় একেই আমরা 'ফণা তোলা' বলি।

প্রকৃতি : প্রধানত নিশাচর, যদিও দিনেও কার্যকলাপ চালু থাকে। সব চেয়ে সক্রিয় ভোরবেলা ও গোধূলিবেলায়। পাহাড়, জঙ্গল বা ফাঁকা সমতল—প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়; জনবসতির আশেপাশেও পাওয়া যায়, বিশেষত রাশিকৃত জঞ্জাল ও আবর্জনা যেখানে রয়েছে, অথবা কৃষিক্ষেত্রের আশেপাশে যেখানে ইঁদুর জাতীয় প্রাণী প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায়। ইঁদুর এদের খুব প্রিয় খাদ্য, কৃষিজমির আশেপাশে ইঁদুরের সংখ্যা আয়ত্তে রাখে ও অতিরিক্ত ইঁদুরের উপদ্রবে শস্যের ক্ষতি রোধ করে। মানুষের সংস্পর্শে এলে ফণা তুলে সাবধান করে, সময়ে সময়ে কামড়ায়।

বিষের ধরন : স্নায়ু আক্রমণকারী (Post-synaptic)।

চেনার উপায় : একটা প্রাপ্তবয়স্ক গোখুরা সাপ গড়ে ৫-৭ ফুট লম্বা হয়। এটা একটা ফণাধর সাপ, ফণার পিছনে জোড়া কাচের চশমার মতো চিহ্ন (০) দিয়ে এই সাপ চেনা যায়। কেউ কেউ এর সঙ্গে গোরুর খুরের সাদৃশ্য পান (তাই বাংলা নাম ''গো'' ''খুরো'')।

কাছাকাছি দেখতে সাপ যাদের সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলা যায় :

(i) **কেউটে (Monocled cobra**, *Naja Kaouthia*) : বাংলা নাম কেউটে। ধবল রোগগ্রস্ত (Albino) কেউটেকে ''খড়িশ'' বলা হয় (খড়ির মতো সাদা বলে)। এটা গোখুরার খুবই কাছাকাছি প্রজাতি— কিন্তু কাছাকাছি হলেও এক নয়; তাই সাপের বিষের প্রতিষেধক (যা গোখুরার বিষে কার্যকরী) তাতে কেউটের বিষে কাজ হবে আংশিক। এর ফণার পিছনে থাকে একটা চাঁদা বা গোল চিহ্ন (◎) — গোখুরার মতো জোড়া গোল বা গোরুর খুর নয়।

গোখুরা কেউটে শঙ্খচুড়

গোখুরা (০) চিহ্ন দেখুন ফণার পিছন দিকে
কেউটে (◎) চিহ্ন ফণার পিছন দিকে
শঙ্খচুড়—সরু ও লম্বাটে ফণা, (⋀) চিহ্ন ও সারা গায়ে ডোরা কাটা দাগ।

গোখুরা-র সঙ্গে অন্যান্য ফণাধর সাপের পার্থক্য

(ii) **কিছু নির্বিষ সাপ যারা আত্মরক্ষার জন্য ভয় দেখাতে ফণা তোলে**— — ''কীলব্যাক'' (The Keelbacks) সাপ পরিবারের বেশ কিছু সদস্য ফণা তোলে, বিশেষত, Green Keelback (সবুজ ঢোঁড়া) ও Checkered Keelback (জলঢোঁড়া), আর কীলব্যাকরা ভারতের প্রধান নির্বিষ সাপেদের অন্যতম। কিন্তু এদের ফণার পিছনে ''চশমা চিহ্ন'' (০) কখনওই থাকবে না।

— লার্জ আইড্ ফলস্ কোবরা (Large eyed false cobra) — নাম শুনেই বোঝা যায় যে এটা হল ''মেকি কোবরা''। এই সাপের সঙ্গে গোখুরার তফাত হল এদের বড়ো বড়ো গোল গোল চোখ থাকে ও ফণার পিছনে 'চশমা-চিহ্ন' থাকে না।

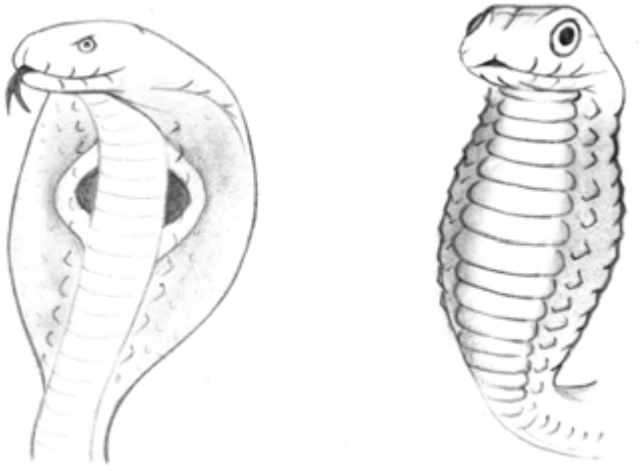

গোখুরা (সামনে থেকে) **লার্জ-আইড্ ফলস্ কোবরা**

(iii) ফণাহীন অবস্থায়, গোখুরা আর দাঁড়াশ সাপ বা Common Indian rat snake (চলতি ভাষায় 'ঢ্যামনা সাপ') খুবই কাছাকাছি দেখতে। কিন্তু দাঁড়াশ সাধারণত অনেক বেশি লম্বা—গড়ে ৭-১২ ফুট। ভারতের নির্বিষ সাপেদের মধ্যে অজগর ও ময়াল-এর পর এটাই দীর্ঘতম। এদের বড়ো বড়ো গোল গোল চোখ হয়, দাঁড়াশের গলার কাছটা মাথার থেকে সব সময় সরু হয় ও দাঁড়াশ কখনও ফণা তোলে না (কখনও কখনও গলার কাছটা ফাঁপিয়ে ফোঁস করে ওঠে কিন্তু ফণা বলতে যা বোঝায় তা কখনওই থাকে না)।

(খ) কালাজ— (Common Krait, *Bungarus caeruleus*) : বাংলা নাম 'কালাজ' বা উচ্চারণভেদে 'কালাচ'। এছাড়াও কালাচিতি, ডোমনাচিতি ও শিয়রচাঁদা নামেও পরিচিত। হিন্দি নাম 'করৈত'। ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই এটা পাওয়া যায়।

কালাজ-এর আক্রমণের ভঙ্গিমা। কুচ্‌কুচে কালো দেহ, কুচ্‌কুচে কালো চোখ-এ মণি দেখা যায় না অন্য সাপের মতো। লক্ষ করুন, হাঁ করার সময় উপরের চোয়াল আনুভূমিক তলে, নীচের চোয়াল নীচের দিকে খোলে—অর্থাৎ হাঁ কখনওই ৯০ ডিগ্রি-র বেশি হবে না। **বিষদাঁত বাইরে বেরিয়ে থাকে না।**

প্রকৃতি : নিশাচর প্রাণী। সাধারণত ঠান্ডা মেজাজের, বিশেষত, দিনে খুবই নিষ্ক্রিয় থাকে, উত্যক্ত করলেও গুটিয়ে থাকে— তাই দিনে কালাজ-এর আক্রমণ বিরল। তবে দিনের বেলায় উষ্ণতার সন্ধানে মানুষের ঘরে বা বিছানায় ঢুকে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকার বদভ্যাস আছে, যে কারণে রাত্রে ঘুমের মধ্যে কালাজের কামড়ের ঘটনা সচরাচর দেখা যায়। জলাশয়ের আশেপাশে ও জঙ্গাল জমে থাকে এমন জায়গায় থাকতে ভালোবাসে। টিকটিকি / গিরগিটি, ব্যাঙ, ইঁদুর খায়, অন্য সাপও খায়, এমনকী, ছোটো কালাজও খেয়ে থাকে (Cannibalism বা স্বগোত্র ভোজন)

বিষের ধরন : স্নায়ু আক্রমণকারী (Pre-synaptic)

চেনার উপায় : কুচ্‌কুচে কালো এই সাপ, সারা দেহ চক্‌চকে মসৃণ আঁশ দিয়ে ঢাকা (smooth glossy scales), যার ফলে সাপটাকে চক্‌চকে মসৃণ ও পিচ্ছিল দেখায়। গায়ে সরু সরু দুধ সাদা ডোরা দাগ—সেটা সমদূরত্বে হতে পারে বা জোড়ায় জোড়ায়ও হতে পারে। ফণাহীন, আক্রমণের সময় মুখ আধো খুলে কামড়ায়। একটা প্রাপ্তবয়স্ক কালাজ ৩-৫ ফুট লম্বা হয় গড়ে। শরীরের প্রস্থচ্ছেদ হয় গোল। চক্‌চকে কালো চোখ, মণি দেখা যায় না।

কাছাকাছি সাপ যাদের সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলা হয় :

(i) কালাজ বা কালাচিতি / ডোম্‌নাচিতির সঙ্গে প্রধানত গুলিয়ে ফেলা হয় ঘরচিতিকে (common wolf snake)। তফাৎ করার উপায়—

(ক) কালাজ কুচ্‌কুচে কালো রঙের হয় আর ঘরচিতি হয় বাদামি রঙের। কিন্তু ঘরচিতি কখনও কখনও কালচে রঙেরও হয়। বিশেষত, ঘরচিতির বাচ্চাগুলোর এমনিই একটু কালচে ভাব থাকে, আবার কালাজ-এর বাচ্চাগুলোর একটু বাদামিভাব থাকে, ফলে গুলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই শুধু রঙ দেখে কখনোই তফাৎ করার চেষ্টা করা উচিত নয়।

(খ) কালাজ-এর ঘাড়ের কাছে ডোরা কখনওই থাকে না— ঘাড়ের কিছুটা পর থেকে ডোরা শুরু হয়। ডোরাগুলো হয় সরু সরু ও দুধ-সাদা, ঘরচিতির ডোরাগুলো চওড়া ও হলদেটে। আর ঘরচিতির ঘাড়ের শুরু থেকেই ডোরা, মাথা ও ঘাড়ের সন্ধিতেই একটা চওড়া ডোরা ''কলার''-এর মতো থাকে।

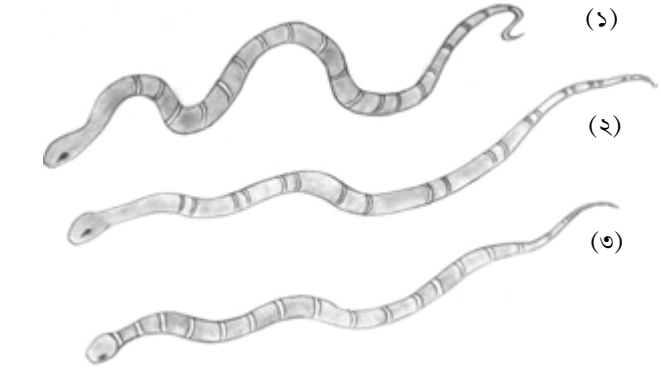

(১) ও (২) কালাজ, সমদূরত্বে বা জোড়ায় জোড়ায় সরু সরু ডোরা দাগ, গলার একটু পর থেকে শুরু হয়। (৩) ঘরচিতি, চওড়া ডোরা মাথা ও গলার সন্ধি থেকেই শুরু।

কালাজ ও ঘরচিতির পার্থক্য

(গ) সর্বোপরি, Krait পরিবারের সাপেদের (কালাজ, শাঁখামুটি) চিহ্নিতকরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল— এদের লেজ (যৌনাঙ্গের পরবর্তী অংশ) এর নীচের আঁশগুলো অবিভক্ত হয় (unpaired)। ঘরচিতি ও অন্যান্য বেশির ভাগ সাপের ক্ষেত্রেই এই আঁশগুলো বিভক্ত থাকে (paired subcaudal scales)। এছাড়া শিরদাঁড়া বরাবর একটা সারি বড়বড় ষড়ভুজাকৃতির আঁশ কালাজ ও শাঁখামুটির থাকে (Large hexagonal scales—single row along the vertebra).

যৌনাঙ্গের আঁশ (Anal Scale)

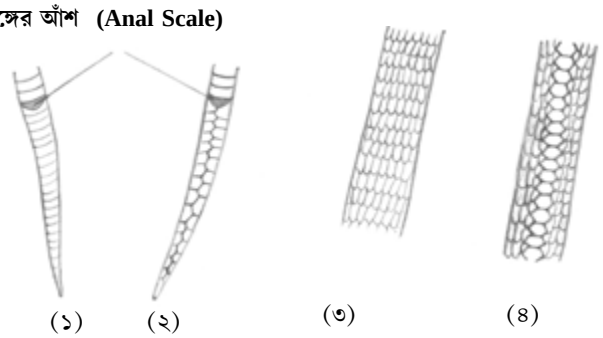

(১) লেজ (অর্থাৎ যৌনাঙ্গের পরবর্তী দেহের অংশ)-এর নীচের আঁশগুলো হয় অবিভক্ত (unpaired subcaudal scales)—কালাজ, শাঁখামুটি ও অন্যান্য Krait পরিবারের সাপ-এ লক্ষিত হয়। (২) লেজের নীচে বিভক্ত আঁশ (Paired subcaudal scales) Krait পরিবার ছাড়া অন্যান্য সাপেদের দেখা যায়। (৩) ঘরচিতির শরীরে আঁশের বিন্যাস (৪) কালাজ ও শাঁখামুটির শরীরে আঁশের বিন্যাস—শিরদাঁড়া বরাবর ষড়ভুজাকৃতির আঁশ লক্ষ করুন।

(গ) **চন্দ্রবোড়া (Russel's viper,** *Daboia russelii*) : বাংলা নাম চন্দ্রবোড়া। হিন্দি নাম ''দবৈয়া'' বা ''চীতি''। উত্তরপূর্ব ভারত ও কাশ্মীর ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতেই বিদ্যমান।

প্রকৃতি : চন্দ্রবোড়া নিশাচর সাপ, দিনে অন্ধকার বা ছায়াযুক্ত জায়গায় লুকিয়ে থাকে (হিন্দিতে ''দবৈয়া'' কথার অর্থই হল ''যে আড়ালে লুকিয়ে থাকে।'') ভীষণ বদমেজাজী সাপ, কাছাকাছি কেউ এলে শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রেসার কুকার-এর মতো শব্দ করে সাবধান করে, একটুতেই কামড় বসাতে উদ্যত হয়। ইঁদুর, ছুঁচো, ইত্যাদি খায়, ছোটো পাখি, টিকটিকি/ গিরগিটি বা ব্যাঙও খায়। তবে জলাশয়ের কাছাকাছি খুব বেশি ঘোরাফেরা করে না— চন্দ্রবোড়া শুকনো ও রুক্ষ এলাকা পছন্দ করে। শুকনো চাষজমি, ঘাসজমি ইত্যাদি জায়গায় পাওয়া যায়। যদিও জনবসতি এলাকাতেও পাওয়া যায় (বিশেষ করে জঙ্গাল জমে থাকা জায়গায়), তবু গোখুরা বা কালাজের তুলনায় চন্দ্রবোড়া অনেক বেশি জনবসতি এড়িয়ে চলে।

চন্দ্রবোড়া 'ভাইপার' গোত্রের সাপ। যে কোনো ভাইপার গোত্রের সাপ আক্রমণের আগে শরীরটাকে স্প্রিং-এর মতো গুটিয়ে নেয়, এই কুন্ডলীকৃত অবস্থান থেকে ছোবল মারে। ভাইপাররা ফণাহীন সাপ— আক্রমণের কালে মুখ প্রায় ১৮০ ডিগ্রি হাঁ করে বিষদাঁত বার করে কামড় দেয়। চন্দ্রবোড়াও ব্যতিক্রম নয়। কয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া ভাইপার গোত্রের সাপেরা ডিম পাড়ে না— সরাসরি বাচ্চার জন্ম দেয়, চন্দ্রবোড়াও তাই।

(ভাইপারদের এটা একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, Boa পরিবারের কিছু সাপ বাদ দিয়ে ভারতের প্রায় বাকি সব সাপই ডিম পাড়ে)।

ভাইপার গোত্রের সাপের আক্রমণের ভঙ্গিমা। আক্রমণের সময় একটা ভাইপার মুখ প্রায় ১৮০ পর্যন্ত হাঁ করতে পারে, বিষদাঁত বাইরে বার করে কামড় দেয়।

বিষের ধরণ : কোষ বিদীর্ণকারী (প্রধানত), কিন্তু কিছু এলাকার চন্দ্রবোড়ার বিষে স্নায়ু-আক্রমণকারী উপাদান (Pre-synaptic, কালাজ এর মতো) থাকে।

চেনার উপায় : যে কোনো ভাইপার গোত্রের সাপের মাথা তে-কোণা ও গলার কাছটা সরু হয়— এতে মাথার দিকটা অনেকটা বর্শার মতো দেখায় (এ কারণে ভাইপার-রা ''Lance-heads'' নামেও খ্যাত)। সমস্ত ভাইপারদের শরীরের সব আঁশ আণুবীক্ষণিক কাঁটা দিয়ে ভর্তি (keeled scale), ফলে এদের দেহ রুক্ষ ও অমসৃণ, অনেকটা শিরিশ কাগজের মতো। কালাজের মতো চক্‌চকে মসৃণ দেহ কোনো ভাইপারের কখনই থাকবে না।

চন্দ্রবোড়া একটা হৃষ্টপুষ্ট সাপ, যদিও খুব একটা লম্বা নয়। একটা প্রাপ্তবয়স্ক চন্দ্রবোড়া গড়ে ৪-৬ ফুট লম্বা। শরীরে তিনটে সারিতে চোখ বা বাদাম-আকৃতির (◇ -চিহ্ন, Eye-Shaped / Almond-shaped) চিহ্ন থাকে। চিহ্নগুলো পৃথক পৃথকও থাকতে পারে আবার জুড়ে গিয়ে একটা টানা নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নও হয়ে যেতে পারে।

কাছাকাছি সাপ যাদের সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলা যায় :

ছোটো অজগর বা একই পরিবারের (Boa পরিবার) ছোটো সাপগুলোর সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে, বিশেষত তুতুর (Common sand boa)। কিন্তু এদের শরীরে চিহ্নগুলো এলোমেলো ও বিসদৃশ (সেনাবাহিনীর উর্দির মতো) কিন্তু চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে এমন নয়। চিনতে জানলে চন্দ্রবোড়া চেনা ভীষণ সহজ, ভুল হওয়ার কথাই নয়।

[এখানে উল্লেখ করে রাখি যে গণ্ডগোল অনেক সময় নামের ক্ষেত্রেও হয়। 'চিতি' নামটা খুব বিভ্রান্তিকর— সাধারণত Indian Wolf Snake কে 'চিতি' বা 'ঘরচিতি' বলা হয়। কিন্তু চন্দ্রবোড়াকেও বহু এলাকায় 'চিতি' বলা হয়। আবার তুতুর (common sand boa) কেও 'চিতি' নামে ডাকা হয়। চিতাবাঘের মতো চাকা চাকা দাগ থাকার জন্যই বোধহয় চন্দ্রবোড়া বা তুতুর-এর এই নাম।]

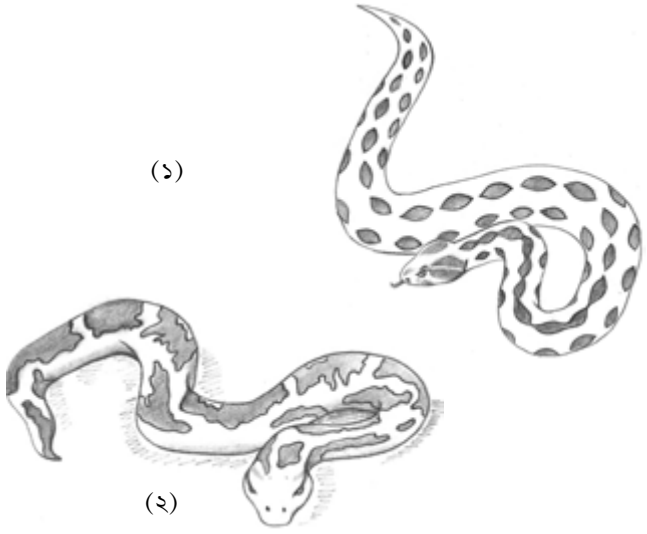

(১) চন্দ্রবোড়া, (২) তুতুর– গায়ের নক্‌শা দিয়ে সহজেই পার্থক্য করা যায়।

(ঘ) ফুরসা (Saw-Scaled viper (*Echis carinatus*)] -বাংলা নাম ফুরসা। হিন্দি নাম ''ফুরসা'', ''অফই'', 'দিয়র' বা ''জলেবীসাঁপ''। এটি প্রধানত ভারতের রুক্ষ, শুষ্ক জায়গাগুলোতে—পাথুরে এলাকায় কিংবা মরুভূমির বালিয়াড়িতে পাওয়া যায়— রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমাঘাট অঞ্চলে এর আধিক্য সবচেয়ে বেশি। পশ্চিমবঙ্গে এই সাপ তুলনায় অনেক কম, প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রকৃতি : প্রধানত নিশাচর, ভোরে ও গোধূলিবেলায় সবচেয়ে সক্রিয়। দিনে বিভিন্ন অন্ধকার জায়গায় লুকিয়ে থাকে— লুকিয়ে থাকাতে এই সাপ বিশেষ পারদর্শী। ছোটো হওয়ার দরুণ ও সহজে নজরে পড়ে না বলে এই সাপের আকস্মিক কামড় প্রায়ই ঘটে থাকে।

এই সাপের একটা বৈশিষ্ট্য হল আক্রমণের আগে শরীরটাকে যখন কুণ্ডলীকৃত করে, তখন গায়ের শক্ত কাঁটার মতো আঁশগুলো একে অপরের সঙ্গে ঘর্ষণের মাধ্যমে একটা কর্কশ করাত চালানোর মতো শব্দ উৎপন্ন করে। তার সঙ্গে 'ফোঁস' শব্দ করে সাবধান করে দেয়, বেশি উত্যক্ত করা হলে বিদ্যুৎ গতিতে ছোবল মারে— ফুরসা কামড় বসানোর গতিতে পৃথিবীর দ্রুততম সাপগুলোর একটা। ফুরসার আরও একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে— ফুরসা সম্মুখপানে চলনেও যেমন সক্ষম তেমনই পাশাপাশিও চলনে পারদর্শী। এর দুটো সুবিধায়—প্রথমত, শত্রুর হাত থেকে পালানোর ক্ষেত্রে এই পার্শ্বচলন ফুরসার গতিবিধিকে করে তোলে অপ্রত্যাশিত। দ্বিতীয়ত, তপ্ত বালির উপর দিয়ে অনায়াসে দেহের সঙ্গে মাত্র দুটো সংযোগবিন্দুর ওপর ভর করেই পাশের দিকে এক প্রকার লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারে এরা।

ফুরসা নানা ধরনের পরিবেশে পাওয়া যায়— জঙ্গল, সমভূমি, পাহাড়ি এলাকা, শুকনো ঘাসজমি কিংবা মরুভূমি। থাকার জন্য বেছে নেয় ঝোপঝাড়, বড় পাথরের খাঁজ ও ফাঁক বা ছোট ছোট পাথরের স্তুপ, বালিয়াড়িতে কাঁটাগাছ, বড় গাছের কোটর, শুকনো ঘাসজমি বা শুকনো পাতার স্তূপ। টিকটিকি / গিরগিটি, ইঁদুর, পোকামাকড়, বিছে ইত্যাদি খায়।

ফুরসার যে প্রজাতিটা ভারতে পাওয়া যায় (*Ectnis carinatus*) সেটা ডিম পাড়ে না, বাকি ভাইপারদের মতো সরাসরি বাচ্চার জন্ম দেয় (আফ্রিকায় যে প্রজাতিগুলো পাওয়া যায় তারা ব্যতিক্রম—তারা ডিম দেয়)।

বিষের ধরন : সমস্ত ভাইপারদের মতোই ফুরসার বিষ প্রধানত কোষ বিদীর্ণকারী।

চেনার উপায় : এটি একটা ভাইপার, তাই ভাইপারের মতো গড়ন, মাথা ও ঘাড়ের আকৃতি, বা আক্রমণের ভঙ্গিমা (পূর্ব বর্ণিত) এতেও লক্ষিত হয়। মাথায় তিরের ফলার মতো চিহ্ন (ψ) দিয়ে এই সাপ শনাক্ত করা হয়। আকারে ছোটো, ১-২.৫ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় গড়ে।

কাছাকাছি সাপ যাদের সঙ্গে এদের গুলিয়ে ফেলা যায় :

(i) এই সাপের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় বঙ্করাজ সাপ (চলতি ভাষায় 'কর সাপ') বা common cat snake-এর। তফাত করা যায় মাথার চিহ্ন দিয়ে— কর সাপ-এর মাথায় (Y) চিহ্ন থাকে যেখানে ফুরসার মাথায় (ψ) চিহ্ন থাকে।

(ii) 'ভাঁড়' নামক একটা সাপ (Mock viper) ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্যগুলোতে পাওয়া যায় যা ভাইপার গোত্রের ছোটো সদস্যগুলোর (১-২.৫ ফুট লম্বা গড়ে) সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। কিন্তু এই সাপের চন্দ্রবোড়ার মতো চিহ্ন থাকে না, মাথায় কিছু সমান্তরাল রেখা বা ওলটানো Y (⅄) চিহ্ন থাকে, ফুরসার মতো (ψ) চিহ্ন থাকে না। সর্বোপরি, ভাইপারদের মতো কাঁটাযুক্ত আঁশ ভাঁড় সাপের থাকে না, এদের আঁশ চক্‌চকে ও মসৃণ।

ফুরসা—কাঁটা যুক্ত আঁশ ও মাথায় (ψ) চিহ্ন

বঙ্করাজ—মসৃণ আঁশ, মাথায় (Y) চিহ্ন

ভাঁড় বা Mock viper — কোনও বিশেষ নক্‌শা নয়, এলোমেলো ও অস্পষ্ট কিছু সমান্তরাল রেখা বা ওল্টানো Y (⅄) চিহ্ন থাকে মাথায়।

ফুরসার সঙ্গে অন্যান্য সাপের পার্থক্য

Big Four ছাড়া অন্যান্য বিষধর সাপ :

(i) **King cobra (***Ophiophagus hannah***)** : বাংলা নাম শঙ্খচূড়। 'কোবরা' নাম হলেও এটা ভিন্ন একটা প্রজাতি। এটা পৃথিবীর দীর্ঘতম বিষধর সাপ—প্রায় ১৯ ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই সাপটাও ভীষণ অন্য সাপ খেতে ভালোবাসে। জঙ্গলে থাকে— পশ্চিমবঙ্গে শুধু সুন্দরবন ও ডুয়ার্স অঞ্চলেই পাওয়া যায়। মারাত্মক বিষধর হলেও এই সাপ সাধারণত মানুষদের এড়িয়ে চলে, শঙ্খচূড়ের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত বিরল।

চেনার উপায় : বিশাল লম্বা ফণাধর সাপ, বেশির ভাগ শঙ্খচূড়েই ডোরাকাটা দেহ, সরু লম্বাটে ফণায় কোনো চিহ্ন থাকে না, (⅄) রকম ডোরা থাকে কখনই কখনই।

(ii) **Banded Krait** (*Bungarus fasciatus*) : বাংলা নাম শাঁখামুটি, হিন্দি নাম ''অহিরাজ'', ''রাজ সাঁপ'' বা ''পত্তিধারী''। Krait পরিবারের সাপ হলেও এবং বিষের ক্ষমতা কালাজ-এর সমান হলেও এটা শান্ত স্বভাবের—মানুষকে কামড়ায়ই না প্রায়। তার বাইরে বিষের প্রকৃতি, ক্ষমতা, সাপের স্বভাব-প্রকৃতি কালাজ-এর মতোই। কালাজ-এর মতোই শাঁখামুটি অন্যান্য সাপ, এমনকী ছোটো কালাজ বা শাঁখামুটি খায় (cannibalism)।

চেনার উপায় : ত্রিকোণাকৃতির পার্শ্বচ্ছেদ বিশিষ্ট (*triangular cross section*) এটার দেহ। মনে পড়ছে নিশ্চয়ই কালাজ-এর দেহ গোল পার্শ্বচ্ছেদ বিশিষ্ট। সারা দেহ চওড়া হলুদ ও কালো ডোরা দিয়ে রঞ্জিত মাথায় (⅄) আকৃতির চিহ্ন। কালাজ-এর মতোই এর সারা দেহ চকচকে মসৃণ আঁশ দিয়ে ঢাকা ও শিরদাঁড়া বরাবর একটা সারি বড়ো বড়ো ষড়ভুজাকৃতির আঁশ থাকে। পরিশেষে, এদের থাকে লেজের নীচে অবিভক্ত আঁশ, যা এই পরিবারের সাপেদের একটা বৈশিষ্ট্য।

(iii) **হাম্প নোজড্ পিট ভাইপার (Hump-nosed Pit viper)** [*Hypnale hypnale*] : এই সাপ বাংলায় পাওয়া যায় না (সেই কারণেই বোধহয় এই সাপের বাংলা নাম উদ্ধার করতে পারিনি)। এটি পশ্চিমাঘাট অঞ্চলে (বিশেষত কর্ণাটক ও কেরল) ও শ্রীলঙ্কা দেশে খুব পাওয়া যায়—কেরলে (মালয়লম ভাষায়) এই সাপ ''চুরুট্ট' নামে ও সিংহলী ভাষায় ''কুনাকাটুয়া'' নামে পরিচিত। খুব সীমিত অঞ্চলে পাওয়া গেলেও এই সাপের কামড়ে মৃত্যুর হার খুব নগণ্য নয়— এমনকি আমাদের দেশের প্রতিষেধক ওষুধে ''তীব্র মহাচার''-এর বিষ ছাড়া এই সাপেরও বিষের প্রতিষেধক যুক্ত করার প্রস্তাব এসেছে।

চেনার উপায় : যে কোনো ''পিট ভাইপার'' চেনা যায় চোখ ও নাকের মাঝখানে একটা কালো গর্ত দিয়ে— এটা ''পিট গ্রন্থি'' (Pit-organ) যা অবলোহিত রশ্মির মাধ্যমে উষ্ণতাকে অনুভব করে শিকার খুঁজতে সাহায্য করে। এই গ্রন্থি পিট ভাইপার ছাড়াও অজগরদের থাকে। 'হাম্প-নোজড্ পিট ভাইপার'-ও ব্যতিক্রম নয়। এছাড়াও (নাম থেকেই বোঝা যায়) এটার নাকটি সামনের দিকে সূঁচালো হয়ে বেরিয়ে থাকে। গড়ে ১-২ ফুট লম্বা, ধূসর, যদিও গায়ের রঙের অনেক রকমফের দেখা যায়।

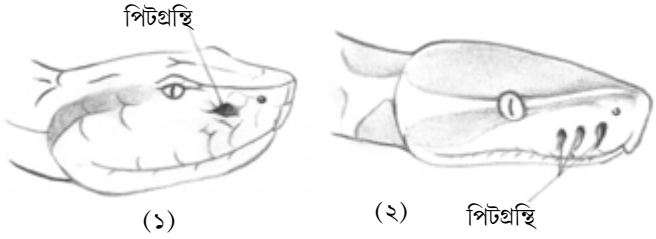

পিট্ গ্রন্থি : চোখ ও নাসারন্ধ্রের মাঝখানে অবস্থিত। পিট ভাইপারদের (১) একটি ও অজগর-জাতীয় সাপেদের (২) একাধিক পিট গ্রন্থি থাকে।

(iv) **অন্যান্য পিট ভাইপার :** *Hypnale hypnale* ছাড়াও ভারতে যে যে পিট ভাইপার প্রজাতি পাওয়া যায় তারা হল *Gloydius himalayanus, Ovoptus monticola, Tripodolaemmus nulloni* ও *Trimeresusus* Sp.-এর ১৪-১৫টা প্রজাতি। এদের বাসস্থান হল—

(ক) **পাহাড়ি বোড়া :** এই সাপগুলো হিমালয়ের পাদদেশে পাওয়া যায়। Himalayan pit viper (*Gloydius himalayanus*) পাওয়া যায় কাশ্মীর, পঞ্জাব ও নেপালে। Mountain pit viper (*Ovophis monticola*) পাওয়া যায় উত্তরাখণ্ড, নেপাল, সিকিম ও উত্তরপূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্যে (অসম, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়— একত্রে বলা হয় 'সাতবোন রাজ্য' বা 'Seven Sisters')।

(খ) **সবুজ বোড়া** (*Trimeresurus gramineus*) বা Bamboo Pit viper : এই সাপ পশ্চিমঘাট অঞ্চল বিশেষত মহারাষ্ট্রে পাওয়া যায়। পাহাড়ি বোড়া ছাড়া বাকি সব পিট্ ভাইপারই গেছো প্রকৃতির, সবুজ বোড়াও তাই। বাঁশগাছের সঙ্গে মিশে থাকে, সহজে নজরে পড়ে না।

Trimeresurus macrolepis (Large-scaled pit viper), *Trimeresurus malabaricus* (Malabar pit viper), *Trimeresurus strigatus* (Horse-shoe pit viper) ও *Tropidolaemus huttoni*— এই চারটি প্রজাতিরও বাস দক্ষিণ ভারতে।

(গ) *Trimeresurus* sp.এর ৩-৪টি প্রজাতি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জগুলোতে ছড়িয়ে আছে, ও ২টি প্রজাতি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলোতে আলোচিত প্রজাতিগুলো বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত প্রজাতির পিট ভাইপারেরই বাস উত্তরপূর্ব ভারতের 'Seven Sisters' রাজ্যগুলোতে।

ভারতের পিট্ ভাইপারেরা আকারে ছোট হয়— গড় দৈর্ঘ্য ১-৩ ফুট। পাহাড়ি বোড়া ও হামপ নোসড্ পিট ভাইপার ছাড়া প্রায় সব পিট ভাইপারই গেছো প্রকৃতির। গায়ে রঙে এদের বিশাল বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, যদিও গেছো সাপগুলোর একটা বৃহৎ অংশ সবুজ রং-এর হয়। শনাক্তকরণ একমাত্র পিট গ্রন্থি দিয়ে।

উপরোক্ত সাপগুলো যদি চেনা থাকে তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আপনাকে অন্য কোনো বিষধর সাপ চেনার প্রয়োজন হবে না। আর কোনো সাপ যদি দেখেন যে ওপরের তালিকায় ফেলা যাচ্ছে না তা হলে আশা করা যেতে পারে যে সেটা নির্বিষ/মৃদুবিষ।

নির্বিষ বা মৃদুবিষ সাপ : আমাদের দেশে নির্বিষ সাপের সম্ভার বিশাল—ক্ষুদ্র পুঁয়ে সাপ (৫-৮ ইঞ্চি লম্বা) থেকে শুরু করে সুবৃহৎ ময়াল সাপ (২০-২১ ফুট লম্বা) এখানে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অপূর্ব সুন্দর কিছু সাপ আছে— কালনাগিনীর কথা কে না জানে, কিন্তু কৃষ্ণশিরা, উদয়কাল বা দুধরাজও কিছু কম যায় না।

ভারতের সাধারণ নির্বিষ সাপগুলো হল—

(i) প্রথমেই উল্লেখ করতে হবে **'কীলব্যাক'**-দের **(The Keelbacks)**। এই সাপগুলো 'Natricinae' উপগোত্রের ৫টি গণের প্রজাতি *Amphiesma* Sp., *Xenochrophis* Sp., *Atretium* Sp., *Macropisthodon* Sp. ও *Sinonatrix* Sp.। এদের শিরদাঁড়া বরাবর কাঁটাযুক্ত আঁশ থাকায় এদের এই নাম। এই দলটা নির্বিষ সাপেদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে। এদের মধ্যে সব চেয়ে সহজপ্রাপ্য হল —

- Checkered Keelback বা *Xenochrophis piscator* (জলঢোঁড়া),
- Striped Keelback বা *Amphiesma stolatum* (হেলে),
- Green Keelback বা *Macropisthodon plumbicolor* (সবুজ ঢোঁড়া),
- Himalayan Mountain Keelback বা *Amphiesema platyceps* (পাহাড়ি ঢোঁড়া) ইত্যাদি।

এ ছাড়াও আরও ডজন-খানেক প্রজাতি আছে, কিন্তু বিরল প্রজাতি নিয়ে তাত্ত্বিক চর্চায় আমরা যাব না।

(ii) **দাঁড়াশ** (Common rat snake বা *Ptyas mucosa*) চলতি ভাষায় 'ঢ্যামনা সাপ'। ঢোঁড়া, হেলে-র পর বোধহয় সব চেয়ে বেশি যে সাপ দেখা যায়, বিশাল লম্বা (৭-১২ ফুট) সাপ। এর দুটো রকমফের—চীনা দাঁড়াশ বা Chinese rat snake (*Ptyas korros*) ও সবুজ দাঁড়াশ বা Green rat snake (*Ptyas nigromarginatus*) পাওয়া যায় উত্তরবঙ্গ, সিকিম, নেপাল ও উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে।

(iii) Banded-racer বা *Argyrogena fasciolata* (খেতমেটে)

(iv) Common Bronzeback tree snake বা *Dendrelaphis tristis* (বেত আছড়া)

(v) Indian wolf snake বা *Lycodon aulicus* (ঘরচিতি)—এই সাপটার কালাজ-এর সঙ্গে সাদৃশ্য ও পার্থক্য করার উপায় আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

(vi) কুকুরমুখো—(Dog-faced water snake বা *Cerberus rynchops*) সুন্দরবন এলাকার খুব চেনা মৃদু লবণাক্ত জলের সাপ।

(vii) Boa পরিবারের সাপেদের ভুললে চলবে না— এরা সবাই হৃষ্টপুষ্ট সাপ ও শিকারকে খুব সহজেই পিষে ফেলতে অত্যন্ত পারদর্শী, তাই এরা ''Constrictors'' নামেও খ্যাত।

- Indian rock python বা *Python molurus* (অজগর)
- Burmese python বা *Python bivittatus* (ময়াল)
- Common sand boa বা *Eryx conicus* (তুতুর)
- Red sand boa বা *Eryx johnii* (বালিবোড়া)

এছাড়াও কিছু অন্যান্য নির্বিষ / স্বল্পবিষ সাপ নজরে পড়ে

(i) পুঁয়ে সাপ বা Brahminy worm snake (*Rhamphotyphlops braminus*)

(ii) রেতি বা Little file snake (*Acrochordus granulatus*)

(iii) দুধরাজ বা Common trinket snake (*Coelognathus helena*)

(iv) কঙ্করাজ বা করসাপ বা Common cat snake (*Boiga trigonata*)

(v) কালনাগিনী বা Ornate flying snake (*Chrysopelea ornata*)

(vi) উদয়কাল বা Common kukri snake (*Oligodon arnensis*)

(vii) কৃষ্ণশিরা বা Dumeril's black-keaded snake (*Sibynophis subpunctatus*)

(viii) লার্জ আইড্ ফলস্ কোবরা (*Pseudoxenodon macrops*)

(ix) লাউডগা বা Green vine snake (*Ahaetulla nasuta*)

(x) ভাঁড় বা Mock viper (*Psammodynastes pulverulentus*)

তবে নির্বিষ সাপগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরের বাইরে।

উপসংহার : তৃতীয় ও অন্তিম খণ্ডের শেষে জমিয়ে উপসংহার লিখতে বসে উপলব্ধি হল যে উপসংহারে বলার মতো সব কথাই আগের দুই সংখ্যায় নিঃশেষিত করে ফেলেছি। তাই আর ভালো থাকুন, সতর্ক থাকুন, বা অমুক-তমুক-এর দাবি তুলুন ইত্যাদি একই ঘ্যানঘ্যানানি দিয়ে আপনাদের বিরক্তি আর বাড়ালাম না। শুধু তিন তিনটে সংখ্যা জুড়ে যারা ধৈর্যের এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তাদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই লেখা শেষ করলাম (অবশেষে!!!)

বিঃ দ্রঃ (ক) সমস্ত হস্তচিত্র লেখকের নিজের আঁকা। লেখক কোনো পেশাদার চিত্রশিল্পী নন, ফলত, ত্রুটি মার্জনা করবেন।

(খ) সমস্ত সাপের মাথায় ও শরীরে যে আঁশগুলো থাকে তার আকার / আকৃতি, সংখ্যা, অবস্থান ও বিন্যাস নির্দিষ্ট হয়। সেই অনুযায়ী সব আঁশেরই নির্দিষ্ট নামও দেওয়া আছে। ছবিতে সেই সব খুঁটিনাটি নিখুঁত ভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়, আঁশের সংখ্যাও গুনে গুনে বসানো সম্ভব নয় — তাতে জটিলতা বেশিই হবে। তাই স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই যে ছবিগুলো "Not drawn to the scale'।

লেখক পরিচিতি : ডা. শেখ মাসুম, এমবিবিএস, শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরি একটা ক্লিনিকে আংশিক সময়ের চিকিৎসক।

KLOSTER Pharmaceuticals

B/13/H/3, Braunfeld Road, Kolkata-700 027,
Phone : 033 2449-0144, Mob.: 98306 63724
E-mail : kloster_pharma@yahoo.co.in
Website : klosterpharma.com

সাফাইকর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে

প্রান্তিক মানুষদের সমস্যা নিয়ে ডাক্তারদের বিশেষ মাথাব্যথা নেই, সমাজের কেউই এঁদের কথা ভাবে না। অথচ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মানবিক হওয়া তো এঁদের বাদ দিয়ে হতে পারে না— লিখছেন **ডা. অভিজিত পাল।**

সালটা বোধ হয় ১৯৯৮ হবে। আমি তখন কলকাতার একটা নামী হাসপাতালে জুনিয়র কনসালট্যান্ট। হাসপাতালের একজন সুইপার আউটডোরে দেখাতে এল—বেশ অসুস্থ, দেখেই বুঝতে পারলাম জন্ডিস হয়েছে। অনেক চেষ্টা করে তাকে একটা জেনারেল বেডে ভর্তি করানো হল। পরীক্ষানিরীক্ষায় ধরা পড়ল তার হেপাটাইটিস বি হয়েছে। খুব দ্রুত তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকল ও কয়েকদিন পরে সে মারা গেল। এই রোগের প্রবল (acute) অবস্থায় কোনো চিকিৎসা তখনও ছিল না আজও নেই। যে ক'দিন সে বেঁচে ছিল ও কথা বলতে পারছিল, তার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থ ফেলার যে আস্তাকুঁড়, সেটা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব তার ছিল। খালিহাতে এই ময়লা তুলে সে ময়লা ফেলার গাড়িতে তুলত। বলা বাহুল্য, এর মধ্যে থাকত রোগীদের ওপর ব্যবহার করা ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ, সূঁচ, স্যালাইন বোতল সেট্ (সূঁচ সহ) ব্লাড ট্রান্সফিউশান সেট ও সূঁচ, রক্ত মাখা তুলো, গজ্, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, প্রায়ই হাতে সূঁচ ফুটে যায় বা রক্ত মাখা তুলো লেগে যায়।

আজকের তুলনায় তখন হাসপাতালের বর্জ্য পদার্থ বর্জন করার পদ্ধতি 'কেয়ারলেস' ও অজ্ঞতাপূর্ণ ছিল। কিন্তু তখন হেপাটাইটিস বি সম্বন্ধে অনেক জানা হয়ে গেছে, ভ্যাক্সিন ব্যবহার করা আরম্ভ হয়ে গেছে। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা সতর্ক হয়ে গেছেন ও ভ্যাক্সিন নেওয়ার রেওয়াজ শুরু হয়ে গেছে। অথচ হাসপাতালের মধ্যেই কাজ করছে একজন মানুষ, তার খবর কেউ রাখত না। এমনই অন্ধ আমরা। এটা বলাই বাহুল্য যে ওই সাফাইকর্মী ওই বর্জ্য পদার্থ ঘাঁটতে ঘাঁটতে এই মারাত্মক ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিল। তার ওপর এই সব মানুষ অল্প বয়স থেকেই মদ্যপান করে ও তাদের যকৃতের অবস্থা আগে থেকেই খারাপ থাকে। এই ঘটনার পর আমার একটা উপলব্ধি হয়েছিল যে আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের নেই। আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুই দেখেও দেখি না। আমাদের অন্তর্দৃষ্টির অভাব।

এর পর আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে চেষ্টা করেছিলাম যাতে সাফাইকর্মীদের হাতে দস্তানা ও পায়ে গাম-বুট দেওয়া হয়। নাক ঢাকার জন্য মাস্ক (মুখোশ) দেওয়া হয়। খুবই হতাশ হয়ে গেছিলাম যখন দেখলাম যে খুব একটা পাত্তা পেলাম না। আরও হতাশার ব্যাপার হল যে অন্য ডাক্তার সহকর্মীরাও এ নিয়ে মাথা ঘামাল না। পরে বুঝলাম যে শ্রেণি-বিভক্ত সমাজে প্রান্তিক মানুষদের কথা চিন্তা করার সময় বা মানসিকতা খুব কম জনের মধ্যে থাকে। তা হলে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করে যদি আমাদের বিজ্ঞান চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির হেরফের না হয়, সমাজ সচেতন আমরা হতে পারব কী করে? আমরা ডাক্তাররা কি এই সব স্বাস্থ্য ও পাবলিক হেলথ কর্মীদের জীবনে ও কাজে কিছু সুরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য জনমত গড়ে তুলতে পারি না? ভ্যাক্সিনের জন্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মানল না যে সাফাই কর্মীদের ভ্যাক্সিন দেওয়া উচিত। আসলে সামান্য কিছু ব্যয় করতেও এরা অনিচ্ছুক।

আর এক জন্ডিস

এর দু'চার বছর পরের কথা বলি। কলকাতা পৌরসভার এক সাফাইকর্মী ভর্তি হলো সেই হাসপাতালেই। কয়েক দিনের খুব জ্বর, গায়ে ব্যথা, লাল চক্ষু, জন্ডিস ইত্যাদি উপসর্গ নিয়ে। দু' একদিনের মধ্যে তার অবস্থার চূড়ান্ত অবনতি হতে লাগলো। মারাত্মক জন্ডিস, কিডনি ফেলিওর, সেপ্টিসিমিয়া ইত্যাদি দেখা দিল। কয়েক দিন যমে-মানুষে টানাটানির পর, ভেন্টিলেটর ইত্যাদি ব্যবহার করে ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার পর তাকে বাঁচানো গেল। কী রোগ হয়েছিল? লেপটোস্পাইরোসিস্ (ওয়াইলস্ ডিজিজ— Weil's Disease)। মারাত্মক রোগ। কী করে হয়? কাদের হয়? এই অসুখটার জীবাণু ইঁদুরের দেহে থাকে ও তার প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে নালার জল ইত্যাদিতে মেশে। এই সব জলে পা ভেজালে এই জীবাণু চামড়ার মধ্যে দিয়ে রক্তে প্রবেশ করে। সুতরাং সাফাইকর্মীরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন হয়েছিল

আমার এই রোগীর। এর প্রতিকার কী? প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন নেই। তা হলে উপায়? হাতে পরতে হবে মোটা রবারের দস্তানা (গ্লাভস্), পায়ে উঁচু গাম্-বুট। এটুকুও আমরা ওদের জন্য ব্যবস্থা করতে পারি না। কেন? উত্তর একটাই। আমরা উদাসীন এই সব ব্যাপারে।

পৌরসভার অনেক ডাক্তার আছে, স্বাস্থ্য আধিকারিক আছে। কিন্তু এই সব ব্যাপারে নজর দেওয়ার মানসিকতাই নেই আমাদের।

গলদটা কোথায়

গোড়ায়। আমাদের চিন্তাভাবনা ছোটবেলা থেকেই এমন ভাবে গড়ে ওঠে ও পরবর্তী জীবনে প্রবাহিত হয় যেটা আমাদের মধ্যে মুক্ত চিন্তার প্রসার ঘটায় না। বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি তর্ক, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ জাতীয় চিন্তা ভাবনার থেকে আমাদের দূরে রাখা হয়। তাই বড় হয়েও আমাদের চিন্তাভাবনা থাকে তমসাচ্ছন্ন ও অবৈজ্ঞানিক। আমরা ডাক্তার হয়েও অনেক সময় আমাদের রোগীদের নিয়ে সামগ্রিকভাবে জানি না। তাই দেখি আজও সাফাইকর্মীরা খালি হাতে নোংরা ঘাটছে, নর্দমার জলে হাত দিচ্ছে, আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেন থেকে কালো পাঁক বার করছে (ভেতর নেমে গিয়ে)। অনেক সময় বিষাক্ত গ্যাস শ্বাস নিয়ে মারাও যাচ্ছে। এদের কোনও বীমা করা থাকে না। অথচ এটা বিরাট পেশাগত ঝুঁকি (Occupational hazard)। আবার দেখা যায় এই সব মানুষগুলো যে সব বস্তিতে থাকে সেখানে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি, এনকেফালাইটিস, ডায়েরিয়া ইত্যাদি রোগ বহুল পরিমাণে আছে। তাই এরা সব দিক থেকেই মার খাচ্ছে, কোনও রকমে বেঁচে আছে। আবার শিক্ষার অভাবে এদের মানবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত। যাঁতাকলের মধ্যে এরা পিষে যাচ্ছে। সমাজের স্বাস্থ্য আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে এদের সমস্যাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ও এদের এই আন্দোলনে সামিল করতে হবে। আর কত কাল আমরা চোখ বুঁজে বা না দেখার ভান করে কাটিয়ে দেব?

লেখক পরিচিতি : ডা. অভিজিত পাল, এমবিবিএস, এমডি, ডিটিএম অ্যান্ড এইচ, ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন; যুক্ত আছেন হাওড়ার শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে ওঠা একটা ক্লিনিকেও।

advt.

এখন **দুর্বার ভাবনা** পাওয়া যাচ্ছে

শিলিগুড়িতে বুকস, কুচবিহারে পার্থ লাহিড়ী, এন এইচ রোড, নবদ্বীপের পোড়ামাতলায় সুজয়া প্রকাশনী, পশ্চিম মেদিনীপুরের ভূর্জপত্র

(বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি রোড), শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখা।

কলকাতায়

হাওড়া স্টেশন (কলকাতা বাসস্ট্যান্ড, হাওড়া বাসস্ট্যান্ড), শিয়ালদহ স্টেশন (সানশাইন বুকস্টল, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয় ও অন্যত্র), কলেজ স্ট্রিট (পাতিরাম, বুকমার্ক, মণীষা গ্রন্থালয়, বইচিত্র ও অন্যত্র)।

রাসবিহারী মোড়, ফুলবাগান (বেলেঘাটা), হাতিবাগান, শ্যামবাজার (পাঁচমাথার মোড়), ঢাকুরিয়া (দক্ষিণাপণের বিপরীতে), বইকল্প (দোতলায়),বিধাননগর (উল্টোডাঙা) স্টেশন ও অন্যত্র।

যাঁরা পত্রিকার এজেন্সি নিতে চান এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

১২/৫ নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬।

অথবা ফোন করুন ০৯৬৭৪ ১৬২০৯৪ অথবা ০৩৩২৫৪৩৭৫৬০।

চেনা ওষুধ অজানা কথা

আইবুপ্রোফেন

ব্যথার সঙ্গে যখন ফোলা, লালভাব ও গরমভাব থাকে তখন সব চেয়ে নিরাপদ ওষুধ হল আইবুপ্রোফেন। আইবুপ্রোফেন নামটা একটু বড়ো বলে অনেকে মনে রাখেন 'ব্রুফেন' (brufen) নামে। ব্রুফেন আইবুপ্রোফেনের সবচেয়ে প্রচলিত ব্র্যান্ড, যদিও এ ওষুধ অন্য অনেক নামে পাওয়া যায় কম দামে, সেগুলোও সমান কার্যকর।

ফোলার সঙ্গে ব্যথা, লাল ও গরমভাব— এই অবস্থার ডাক্তারি নাম inflammation বা প্রদাহ। শরীরে যে সব রাসায়নিকের জন্য প্রদাহ হয়, সেগুলোর মাত্রা কমিয়ে আইবুপ্রোফেন প্রদাহ কমায় অনেকটা অ্যাস্পিরিনেরই মতো। কিন্তু অ্যাস্পিরিনের মতো পাকস্থলীতে ঘা সাধারণত তৈরি করে না আইবুপ্রোফেন।

রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস, অস্টিওআর্থ্রাইটিস, গাউটের ব্যথা কমায় আইবুপ্রোফেন। অল্প থেকে মাঝারি মাথাব্যথা, মাসিকের সময়কার ব্যথা, মোচ খাওয়ার ব্যথা, মাংসপেশি ও হাড়ে চোট খাওয়া ব্যথা, এমনকী অপারেশনের ব্যথাও কমায় আইবুপ্রোফেন। এ ওষুধ জ্বরও কমায়।

আইবুপ্রোফেন পাওয়া যায় ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ও সিরাপ রূপে। বেশি ব্যবহার করা হয়ায় এন্টেরিক কোটেড ট্যাবলেট, যার আস্তরণ পাকস্থলী পেরিয়ে অন্ত্রে গিয়ে খোলে।

প্রাপ্তবয়স্কদের মাত্রা সাধারণত দিনে তিনবার ২০০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম। বেশি ওজনের মানুষদের দিনে তিনবার ৬০০ মিলিগ্রাম। শিশুদের দিনে মোট প্রতি কিলোগ্রাম ওজন পিছু ২০ মিলিগ্রাম তিনভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। (তবে মাত্রা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ীই দেওয়া উচিত)।

আইবুপ্রোফেন খাওয়ার আধ ঘণ্টা আগে বা দুই ঘণ্টা পরে খেলে রক্তে ভালো মেশে। কিন্তু পাকস্থলীতে অসুবিধা এড়ানোর জন্য খাওয়ার পর খেতে বলা হয়। এ ওষুধ খাওয়ার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে শোবেন না।

ওষুধের একটা মাত্রা (ডোজ) যদি খেতে ভুলে যান, তা হলে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিন, তবে ওষুধটা খালি পেটে খাবেন না। আর যদি খুব বেশি দেরি হয়ে যায়, পরের মাত্রার সময় প্রায় হয়েই যায়, তা হলে ভুলে যাওয়া মাত্রাটা বাদ দিন।

আইবুপ্রোফেন বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেললে ঝিমুনি, কানে ঝিঁঝিঁ ভাব, পেটে ব্যথা, ভারসাম্য হারানো এমনকী অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারেন রোগী। যত তাড়াতাড়ি পারেন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ব্যথা কমানোর জন্য যখন আইবুপ্রোফেন ব্যবহার করা হচ্ছে তখন প্রয়োজন ফুরোলেই ওষুধ বন্ধ করতে পারেন, কিন্তু বাতের জন্য আইবুপ্রোফেন দেওয়া হলে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেই এ ওষুধ বন্ধ করা উচিত।

যে রোগীর কিডনির রোগ, লিভারের রোগ, হার্টের রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, পেপটিক আলসার, অম্বল-বুকজ্বালা, হাঁপানি, অ্যাস্পিরিনে-অ্যালার্জি— এ সবের কোনোটা আছে, তিনি ডাক্তারকে জানিয়ে রাখুন; এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু প্রয়োজনীয় সাবধানতা নেবেন।

গর্ভাবস্থায় আইবুপ্রোফেন খেলে বাচ্চার জন্মগত বিকৃতি হতে পারে, প্রসবকাল দীর্ঘায়িত হতে পারে। তাই ব্যবহার না করাই ভালো।

মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ালে দুধের সঙ্গে অল্প পরিমাণে আইবুপ্রোফেন বাচ্চার শরীরে যায়। ব্যবহার করবেন না, ব্যবহার করতে হলে বাচ্চাকে দুধ না খাওয়ানোই ভালো।

দশ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এ ওষুধের নিরাপত্তা প্রমাণিত নয়। যদি দিতেই হয় কম মাত্রায় দিতে হবে।

৬০ বছরের বেশি বয়সীদের আইবুপ্রোফেনে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি, তাই মাত্রা কমাতে হয়।

আগেই বলেছি আইবুপ্রোফেনে ঝিমুনি হতে পারে, তাই ড্রাইভিং-এর মতো বিপজ্জনক কাজে সাবধানতা চাই।

আইবুপ্রোফেনে কারওর কারওর সূর্যালোকে সংবেদনশীলতা দেখা যায়। আইবুপ্রোফেন চলাকালীন মদ খেলে পাকস্থলীর সমস্যা বাড়ে।

আইবুপ্রোফেনের যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বেশি দেখা যায় তার মধ্যে আছে— চামড়ায় ফুসকুড়ি, মাথাব্যথা, ঝিমুনি, বদহজম, বমি ও বমিভাব। কম দেখা যায়—দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, কানে ঝিঁঝিঁ আওয়াজ, অবসাদ, মুখে ঘা, চামড়ায় ঘা, খুব মাথাব্যথার সঙ্গে জ্বর ও ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, পেপটিক আলসার, জন্ডিস, কিডনির সমস্যা (প্রস্রাব করতে ব্যথা, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত ওয়া), ক্লান্তি ও দুর্বলতা, গলায় ঘা ও জ্বর, রক্তক্ষরণ, শ্বাসকষ্ট বা সাঁইসাঁই আওয়াজ। যে সমস্যাই হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

মনোরোগের ওষুধ লিথিয়ামের সঙ্গে আইবুপ্রোফেন ব্যবহার করলে লিথিয়ামের বিষক্রিয়ার ঝুঁকি বাড়ে।

একই রকম হয় হার্ট ফেলিওরের ওষুধ ডিগক্সিনের সঙ্গে বা প্যারাসিটামলের সঙ্গে ব্যবহার করলে। প্যারাসিটামলের সঙ্গে ব্যবহার করলে কিডনির ক্ষতি হতে পারে। (অথচ ব্যথার বহু প্রচলিত নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্র ওষুধে আইবুপ্রোফেনের সঙ্গে প্যারাসিটামল থাকে, এমনই একটা ব্র্যান্ড Combiflam)।

মূত্রবর্ধক ও উচ্চ রক্তচাপের ওষুধের ক্রিয়া কমায় আইবুপ্রোফেন।

রক্ত তরল রাখার ওষুধ, কর্টিকোস্টেরয়েড, অন্যান্য অস্টেরয়েড প্রদাহরোধী ওষুধ, অ্যাস্পিরিন, মৃগীর ওষুধ ভ্যালপ্রোয়িক অ্যাসিড, ইত্যাদির সঙ্গে ব্যবহার করলে রক্ত ক্ষরণের ঝুঁকি বাড়ে— তাই আইবুপ্রোফেন সঙ্গে দিলে মাত্রা কমাতে হয়।

এত সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা শুনে ভয় পাবেন না। পঞ্চদশ শতকের চিকিৎসাবিজ্ঞানী প্যারাসেলসিয়াস বলেছিলেন : 'সব কিছুই বিষ, এমন কিছুই নেই যা ক্ষতিকর নয়, মাত্রাই ঠিক করে তাতে বিষক্রিয়া হবে কি না।' ডিজিটালিসের আবিষ্কারক উইলিয়াম উইদারিং বলেছিলেন : 'বিষগুলো খুব কম মাত্রায় ভালো ওষুধ আর ভালো ওষুধ খুব বেশি মাত্রায় বিষ।'

মনে রাখুন ব্যথার সঙ্গে ফোলা থাকলে সবচেয়ে নিরাপদ আইবুপ্রোফেন ব্যবহার করা।

সংকলন :

A Lay Person's Guide to Medicines, LOCOST, Vadodara, 2006

ধর্ম-জাতপাত-অযুক্তি-কর্তৃত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপনার যুক্তিবাদী মননচর্চার দীর্ঘদিনের সাথী

একুশ শতকের যুক্তিবাদী

পড়ুন ও পড়ান।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় মুখপত্র

আপনার খাদ্যাভ্যাসেই আপনার শারীরিক সমস্যার মুক্তি

অনন্যা মন্ডল

একদিন চেম্বারে মধ্য-চল্লিশের এক অ-বাঙালি ভদ্রমহিলা এলেন, বেশ গোলগাল। মধ্যপ্রদেশ স্ফীত —এক ঝলক দেখেই অনুমান করা গেল যে তিনি শরীরে মাত্রাধিক ফ্যাট সযত্নে লালিত করছেন। তার বয়ানে ও রিপোর্টের ভিত্তিতে জানলাম যে তিনি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় ভুগছেন। তার খাদ্যাভাস শুনে বেশ আশ্চর্য হলাম জেনে যে উনি কাঁচা লবণ খাওয়ার বিকল্প হিসাবে লবণ শুকনো খোলাতে ভেজে খাচ্ছেন মাস দুয়েক ধরে, এক নিকট আত্মীয়ের পরামর্শ অনুযায়ী। শুকনো খোলায় বাদাম, ছোলা বা চিঁড়ে ভাজায় অভ্যস্ত হলেও 'লবণ ভাজা' শুনে আমার রীতিমতো বিষম খাওয়ার যোগাড়। এহেন লবণ প্রীতির ফলস্বরূপ তাঁর রক্তচাপ সমস্যার কোনো সুরাহা তো হয়ইনি, বরং ডাক্তারের ওষুধ এড়ানোর জন্য চাপে পড়ে তিনি আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। আমার অবাক হওয়ার আরও বাকি ছিল, যখন জানলাম যে লাঞ্চে উনি প্রায় দিনই চাপাটি বা পরোটার সঙ্গে মিক্সড আচার ও স্যাঁকা পাঁপড় খান।

আরেক দিন বিকালে হাসপাতালের চেম্বারে বসে আছি, হঠাৎ এক পুরোনো পেশেন্টের উদ্বিগ্ন ফোন— ওঁর ক্লাস সিক্সের ছেলের প্রচণ্ড পেটের গোলযোগ (Stomach upset) হয়েছে, বমিও করেছে বার কয়েক। তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বমি ও বারবার বাথরুম যাওয়াটা স্থিতিশীল হলেও ছেলেটা ভীষণ ভাবে নেতিয়ে পড়েছে। কী খেয়েছে জানতে চাওয়ায়, উনি বলেন— কয়েক বার ORS ছাড়া কোনো খাবারই দেওয়া হয়নি। মনে মনে ভাবলাম এটাই কি স্বাভাবিক নয়?

এরকম কত উদাহরণই আছে। এই জাতীয় রোজকার রোগ মানুষকে ভ্রান্তি ও দুর্ভোগের পথে নিয়ে যায় এবং এই পরিস্থিতিতে কী কী খাওয়া উচিত তা নিয়ে রোগী আর রোগীর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে রয়েছে বিস্তর মতবিরোধ। তা হলে এবার এই মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত রোগগুলোতে কি কি খাওয়া উচিত সে বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)

আমার সেই রোগিণীর মতো যারা ভাবছেন যে লবণ হাল্কা গরম করে খেলে এই উচ্চ রক্তচাপ ব্যাপারটা থেকে নিস্তার পাবেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি, এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। কারণ আপনি খাওয়ার পাতে কাঁচা লবণ খান বা ভাজা লবণ খান অথবা রান্নাতে লবণ দিয়ে খান, ব্যাপারটা কিন্তু একই এবং সমস্যাটাও একই জায়গায় আটকে আছে যে আপনি লবণ খাচ্ছেন, যে কোনো ভাবেই। তবে উপায়? উপায় একটাই, লবণ খাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা। দিনে ২-৩ গ্রামের বেশি লবণ গ্রহণ না করাই ভালো। সঙ্গে লবণ-যুক্ত জিনিস যেমন—নোনতা বিস্কুট, মাখন, আচার, পাঁপড়, চিপস, কৌটোবন্দি মাছ, মাংস ইত্যাদি থেকে দূরে থাকাটাই শ্রেয়। তবে পটাশিয়াম লবণযুক্ত ফল খেতে পারেন যেমন— কলা, পীচ ফল, তাল, তরমুজ, খরমুজ, ফুটি, কমলালেবু, বাতাবি লেবু, পাতি লেবু, কিসমিস ইত্যাদি। এই ফলগুলো দেহের লবণের (সোডিয়াম ও পটাশিয়াম) মাত্রার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখবে।

পেট খারাপ (Stomach Upset)

প্রথমেই যেটা বলা দরকার, পেটের গন্ডগোলে রোগীকে উপোস করিয়ে রাখাটা বোকামির শামিল। ORS-এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই খাবার দিতে হবে। ORS তৈরি করার সময় মাথায় রাখতে হবে যে, এক লিটার ফুটিয়ে ঠান্ডা করা জলে একটা ORS এর প্যাকেট (ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়) গুলতে হবে। এছাড়া খুব সহজে বাড়িতে আমরা ORS তৈরি করতে পারি। এক গ্লাস জলে ৫ চা-চামচ চিনি এবং তিন আঙুলের এক চিমটে লবণ, এক টুকরো লেবুর রস সহযোগে তৈরি শরবত বারে বারে রোগীকে দেওয়া যেতে পারে, যাতে দেহে লবণের মাত্রায় ভারসাম্য থাকে। এক্ষেত্রে কচি ডাবের জল খুবই উপকারী। প্রাকৃতিক নিয়মে ডাবের জল খনিজ লবণে (সোডিয়াম ও পটাশিয়াম) পরিপূর্ণ। এছাড়া জ্যান্ত পোনা, বাটা, সরপুঁটি, শিঙ্গি, মাগুর ইত্যাদি কম চর্বিযুক্ত মিষ্টি জলের

মাছ ও আলু, পটল, কাঁচাকলা, কুমড়ো দিয়ে হালকা ঝোল এবং ভালো ভাবে সেদ্ধ হওয়া ভাত দেওয়া যেতে পারে। স্ন্যাক্সের সময় অর্থাৎ বিকেলের দিকে সেদ্ধ মুসুর ডালের জলের সঙ্গে লবণ ও অল্প সর্ষের তেল বা সাদা তেল এবং ডালের জল ঠান্ডা করে তাতে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস যোগ করে রোগীকে অনায়াসেই দেওয়া যায়। তাতে রোগীর খাওয়ার ইচ্ছেটা বাড়বে এবং দুর্বল ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে উঠবে। পেটের গন্ডগোল থেকে সেরে ওঠার সময়, রোগীকে মুরগীর মাংসের পাতলা ঝোল (গাজর ও আলু দিয়ে) বা স্যুপ দিনে দু'বেলা (দুপুর ও রাত্রে) দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাংস খুব ভালো ভাবে সেদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অনেকের মনে হতেই পারে যে পেটের গন্ডগোলে শিঙ্গি, পটল ছেড়ে মুরগীতে হাত বাড়ানো কতখানি যুক্তিযুক্ত। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে মুরগীর মাংসে যে ধরনের প্রোটিন থাকে তা অধিক মাত্রায় গ্রহণ করলে কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা বাড়ে। অর্থাৎ মুরগীর মাংসের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করা যেতেই পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)

এই সমস্যাটা কাটিয়ে উঠতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করতে হবে, অন্তত দিনে ৮ থেকে ১০ গ্লাস। ঘুম থেকে উঠে এবং ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস অল্প উষ্ণ জল (কিছু না মিশিয়ে) পান করুন। এই ব্যাপারে নিজের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনাটাও খুব জরুরি। দিনের মেনু প্ল্যানে ডায়েটারি ফাইবার অবশ্যই রাখতে হবে। ডায়েটারি ফাইবার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা হল যে স্যালাড (শসা, লেটুস পাতা, টমেটো ইত্যাদি) একমাত্র ডায়েটারি ফাইবার এর উৎস। যে কোনো ধরনের শাক এবং সবুজ সবজিও কিন্তু ডায়েটারি ফাইবার এর উৎস, শুধু তাই নয় শাকসবজি ভিটামিন ও খনিজ লবণেও পরিপূর্ণ। এছাড়াও আরও অনেক উৎস আছে ডায়েটারি ফাইবারের যেগুলো আপনি আপনার খাদ্যাভাসে যোগ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে নিজের পছন্দের খাবারগুলোকে বাতিলের খাতায় না রাখলেও চলবে। আপেল, আলুবোখরা, খোবানি, পাকা কলা, পাকা পেঁপে, আঙুর, কমলা লেবু, ব্রোকলি, বাঁধাকপি ইত্যাদিতে যে ধরনের ফাইবার উপস্থিত তা জল ধরে রাখতে সাহায্য করে, ফলে মল নরম হয়। আবার যে কোনো ধরনের সবুজ শাক, ভুট্টা, খোসাযুক্ত ডাল, ভূষি ইত্যাদিতে যে ধরনের ফাইবার থাকে তা মলের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। অর্থাৎ মেনু এমন ভাবে প্ল্যান করা প্রয়োজন যাতে এই দু' ধরনের ফাইবারই থাকে।

চিকেন পক্স (Chicken Pox)

শীতের শেষে দিকেই চিকেন পক্সের প্রকোপ দেখা যায়। এই অবস্থায় রোগীকে সব ধরনের খাবারই দেওয়া যেতে পারে। তবে কম মশলাযুক্ত এবং সহজপাচ্য খাবার দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। খেয়াল রাখতে হবে যাতে খাবার থেকে পেটের গণ্ডগোল বা আনুষঙ্গিক সমস্যা না হয়। তাই রান্না করার সময় পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখাটাও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত গুটি শুকনোর সময় প্রোটিন জাতীয় খাদ্য যেমন— মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, মাশরুম ইত্যাদি অবশ্যই যেন মেনুতে থাকে। কারণ নতুন কোষ গঠনের এবং কোষের মেরামতের ক্ষেত্রে প্রোটিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রোটিনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শর্করা জাতীয় খাবারকে ভুললে চলবে না। এই ক্ষেত্রে পায়েস, পুডিং, খিচুড়ি ইত্যাদি হল প্রোটিন ও শর্করা এক সঙ্গে পাওয়ার সহজ উপায়। আর বাঙালিদের জন্য মাছের ঝোল আর ভাত তো তুরুপের তাস। চিকেন পক্স রোগীদের জ্বরের উপসর্গ থাকার ফলে খাওয়ার ইচ্ছা কমে যায়। তাই মেনুতে তেতো তরকারি অর্থাৎ শুক্তো, তেতো ডাল, করলা বা উচ্ছে ভাজা ইত্যাদি রাখা ভালো। এছাড়া মধ্য-সকালে যে কোনো একটা মরসুমি ফল বা বাড়িতে বানানো ফলের রস বেশ উপকারী। বিশেষত পেয়ারা মুখের স্বাদ ফেরাতে সাহায্য করে।

জন্ডিস (Jaundice)

জন্ডিস রোগীকে সম্পূর্ণ সেদ্ধ খাবার না খাইয়ে, অল্প তেলে রান্না খাবার দেওয়া যেতে পারে। এতে খাবারের স্বাদও বাড়ে আর রোগীর খাওয়ার ইচ্ছেটাও বজায় থাকে। তা ছাড়া আমাদের দেহে ফ্যাটেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। সরল শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি করে গ্রহণ করতে হবে। শর্করা জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহের শুধু মাত্র শক্তির উৎসই নয় বরং পেশির প্রোটিন ভাঙাকে রোধ করে। বাড়িতে তৈরি যে কোনও ফলের রস, লবণ ও লেবু যোগ করে রোগীকে দেওয়া যেতে পারে। রাস্তায় অস্বাস্থ্যকর ভাবে তৈরি আখ বা অন্যান্য ফলের রস না খাওয়াই ভালো। বাইরের খাবার খাওয়াতে এই কয়দিন রাশ টানা উচিত। দেহের নিয়মিত প্রোটিনের চাহিদা তো পূরণ করতেই হবে। জন্ডিস রোগীর ক্ষেত্রে দুধ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনকেই প্রথম সারিতে রাখা হয়। এক্ষেত্রে দই বা ঘোল, ছানা, ছানার জল ও অন্যান্য কম ফ্যাটযুক্ত দুগ্ধজাত খাবার খাওয়া যেতে পারে। চা বা কফির মতো উদ্দীপক গ্রহণের মাত্রা এই সময় কমিয়ে দিতে হবে, যাতে প্রয়োজনীয় ঘুম বা বিশ্রাম ব্যাহত না হয়।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে অবহেলা না করে অবিলম্বে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত। ঠিকমতো চিকিৎসার সঙ্গে নিয়মমতো খাওয়া-দাওয়া ও পর্যাপ্ত বিশ্রামই আরোগ্য লাভের পথকে প্রশস্ত করে।

লেখক পরিচিতি : অনন্যা মণ্ডল, এম এসসি (অ্যাপ্লায়েড নিউট্রিশন) পিজিডিএসএস, ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্ট

মেয়েদের সাদা স্রাব কি স্বাভাবিক?

সাদা স্রাব বা ইংরাজিতে লিউকোরিয়া হল জলের মতো ও গন্ধহীন স্রাব, এর সঙ্গে কোনো চুলকানি, ফুসকুড়ি ইত্যাদি থাকবে না। সাধারণত এই সাদা স্রাব স্বাভাবিক ব্যাপার, চিকিৎসার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু অস্বাভাবিক স্রাব থেকে একে আলাদা করা দরকার ও অস্বাভাবিক যোনি স্রাবের কারণ খুঁজে বের করে তার চিকিৎসাও দরকার— লিখছেন **ডা. পুণ্যব্রত গুণ**।

সাদা স্রাব কথাটা ইংরেজি 'লিউকোরিয়া' শব্দের বাংলা রূপ। স্ত্রীরোগ চিকিৎসার বইতে 'লিউকোরিয়া' বা সাদা স্রাব এবং সংক্রমণের ফলে অস্বাভাবিক যোনি স্রাবকে আলাদা বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। যোনির অস্বাভাবিক রস বেরোনো তখনই 'লিউকোরিয়া' বলা হবে যখন স্রাব হবে জলের মতো (non-purulent) এবং গন্ধহীন। এছাড়া যে পথে রস বেরোচ্ছে সেখানে কোনো চুলকানি হবে না। যোনি থেকে এই ধরনের রস বেরোনো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শরীরের স্বাভাবিক ব্যাপার। অথচ অনেকে মনে করেন এর জন্য শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর কারণ ভালো ভাবে মহিলাদের বুঝিয়ে বললে তাঁরা ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। এর চিকিৎসার জন্য ওষুধের কোনো প্রয়োজনই হয় না। তাছাড়া এ ধরনের সমস্যাকে কোনো ওষুধ দিয়েই সারানোও যায় না কারণ ব্যাপারটা আদপেই কোনো অসুখ নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লিউকোরিয়ার জন্য দায়ী হল জরায়ুর মুখ (Cervix)-এর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ (Chronic cervicitis), অথবা পলিপ (polyp), ইত্যাদি। কখনও কখনও অ্যানিমিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বসে বসে কাজ করা (sedentary work) ইত্যাদির জন্যও যোনিপথে বেশি রস বার (লিউকোরিয়া) হতে পারে। জীবাণুর সংক্রমণের জন্য যোনি পথের স্রাবকেও মেয়েরা 'সাদা স্রাব' বা 'লিউকোরিয়া' বলে চিহ্নিত করেন। লিউকোরিয়া হল যোনিপথের স্রাব কিন্তু যোনিপথের সব স্রাবই লিউকোরিয়া নয়। জীবাণুর সংক্রমণে যোনিপথের স্রাব হলে সেই রস হবে দুর্গন্ধযুক্ত, ভারি, ঘন বা পুঁজের মতো (purulent)— এ ক্ষেত্রে স্রাবের জায়গায় চুলকানি থাকতে পারে।

যোনিপথ (vagina) আর জরায়ু মুখ (cervix)-এ ছোটো ছোটো অনেকগুলো গ্ল্যান্ড (gland) আছে, ওই গ্ল্যান্ডগুলো থেকে বেরোনো রসই যোনির স্রাব (vaginal discharge)। এই স্রাবকেই আমরা বলি সাদা স্রাব।

যোনি স্রাব কী কাজ করে?

জরায়ুর সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ স্থাপনের পথ হল যোনি। তাই যোনিতে সংক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যোনির রস অম্লধর্মী (acidic) হওয়ার জন্য জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। যোনিতে স্বাভাবিক অবস্থায় কিছু ব্যাকটিরিয়া থাকে যারা যোনির ভেতরের পরিবেশের অম্লত্ব বজায় রাখে। যেমন মুখ দিয়ে লালা বার হয় বা চোখের ওপরের পাতার ভেতরে থাকা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড থেকে ক্রমাগত চোখের জল বার হয় চোখকে পরিষ্কার রাখতে, তেমনি সুস্থ যোনিপথে রস বার হয় যোনিপথকে পরিষ্কার রাখার জন্য।

বয়ঃসন্ধির সময়ে মেয়েদের মাসিক রজোস্রাব শুরু হওয়ার সময় থেকে বরাবরের জন্য মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও যোনি থেকে রস (স্রাব) বেরোনো স্বাভাবিক ব্যাপার।

কতটা স্রাব হওয়া স্বাভাবিক?

এক এক জন মহিলার স্বাভাবিক স্রাবের মাত্রা (মাসিক রক্তস্রাব নয়) এক এক রকম। আবার একজন যতটা স্রাব হলে বেশি বলে মনে করেন, আরেক জন হয়তো সে পরিমাণকেই স্বাভাবিক মনে করেন।

তবে সাদা স্রাবের জন্য যদি বার বার কাপড় বদলাতে হয় বা দিনে কয়েকবার প্যান্টি বদলাতে হয় তবে স্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

মহিলার শরীরে যৌন হর্মোনের মাত্রা পরিবর্তনের ওপর স্রাবের পরিমাণ নির্ভর করে। রজোস্রাব শুরু হওয়ার আগের সপ্তাহে, গর্ভাবস্থায় বা বাচ্চা বন্ধের বড়ি খেতে থাকলে স্রাবের পরিমাণ বাড়ে।

স্বাভাবিক স্রাবের রঙ কেমন?

স্বাভাবিক স্রাব সাধারণত জলের মতো স্বচ্ছ বা হালকা হলুদ রঙের।

অস্বাভাবিক সাদা স্রাব কখন বুঝবেন?

যোনি স্রাবের রঙ বা পরিমাণের পরিবর্তন যোনিপথের জীবাণু সংক্রমণের লক্ষণ হতে পারে। নীচের উপসর্গ লক্ষণগুলো আছে কিনা খেয়াল রাখুন—

- সাদা স্রাবের সঙ্গে চুলকানি, ফুসকুড়ি বা ব্যথা।
- লাগাতার বেশি মাত্রায় স্রাব হতে থাকা।
- প্রস্রাব করবার সময় চামড়ায় জ্বালা করা।
- সাদা, জমাট বাঁধা স্রাব (দেখতে অনেকটা ছোটো শিশুদের মায়ের দুধ বমি করে তোলা ছানার মতো)।
- ছাই/সাদা বা হলুদ/সবুজ রঙের দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব।

কখন ডাক্তারের সাহায্য দরকার?

- যদি সাদা স্রাবের সঙ্গে জ্বর এবং /অথবা পেটে বা তলপেটে ব্যথা থাকে।
- যদি এমন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলন হয়ে থাকে যাঁর গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া বা অন্য কোনো যৌন রোগ আছে।
- যদি খিদে বা জলতেষ্টা বেড়ে যায়, ওজন অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায়, বারবার প্রস্রাব পায় বা ক্লান্তি লাগে—এগুলো ডায়াবেটিসের উপসর্গ হতে পারে। ডায়াবেটিস হলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে ও তার জন্য অতিরিক্ত সাদা স্রাব হতে পারে।
- বয়ঃসন্ধির আগেই যদি কোনো মেয়ের সাদা স্রাব হয়।
- যদি মনে হয় সাদা স্রাব কোনো ওষুধের কারণে হচ্ছে।
- যদি মনে হয় যে কোনো যৌন রোগ হয়ে থাকতে পারে।

- যদি যোনিপথে বা যোনি দ্বারে ফোস্কা বা অন্য ঘা দেখা যায়।
- যদি প্রস্রাবে জ্বালা বা অন্যান্য উপসর্গ থাকে। এটা মূত্রতন্ত্রের জীবাণু সংক্রমণের জন্যও হতে পারে।

রোগীকে যে সব প্রশ্ন করা ডাক্তারের উচিত

- কবে থেকে অস্বাভাবিক স্রাব শুরু হল?
- পুরো মাসটাই কি স্রাবের পরিমাণ ও ধরন একই রকম থাকে?
- স্রাব দেখতে কেমন?
- গন্ধ আছে কী?
- ব্যথা, জ্বালা বা চুলকানি আছে কী?
- স্বামী বা সঙ্গীর লিঙ্গ থেকেও অতিরিক্ত রস বা পুঁজ বের হচ্ছে কি?
- একাধিক যৌনসঙ্গী আছে কি না বা এমন যৌনসঙ্গী আছে যাঁকে বা যাঁদের ভালোমতো চেনা নেই?
- জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
- কন্ডোম ব্যবহার করা হয় কি?
- এমন কিছু ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে যাতে সাদা স্রাব কমে?
- এই অসুখের জন্য যে সব মলম পাওয়া যায় তার কোনোটা লাগিয়ে উপকার পাওয়া গেছে কি?
- যোনিপথে ডুশ্ ব্যবহার করা হয় কি না?
- এছাড়া পেটে ব্যথা, যোনিপথে চুলকানি, জ্বর, যোনি দিয়ে রক্ত ক্ষরণ, ফুস্কুড়ি, আঁচিল বা ঘা, প্রস্রাব করতে কষ্ট বা ব্যথা, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়ার মতো কোনো উপসর্গ আছে কি?
- রোগী কী কী ওষুধ ব্যবহার করেন?
- কোনো কিছুতে রোগীর অ্যালার্জি আছে কি?
- সম্প্রতি নতুন কোনো কাপড় কাচার বা গায়ে মাখার সাবান বা ডিওডোর‍্যান্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা শুরু করা হয়েছে কি?
- রোগী খুব টাইট অন্তর্বাস (প্যান্টি) পরেন কি না?

রোগী ও ডাক্তারের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের পর

ডাক্তার রোগীর শারীরিক পরীক্ষা করবেন

এই পরীক্ষার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল হাঁসের ঠোঁটের মতো একটা যন্ত্র যোনিপথে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষা করা (Speculum examination)। কুমারী মেয়েদের এই যন্ত্র ঢুকিয়ে পরীক্ষা করা যায় না।

কী কারণে সাদা স্রাব হচ্ছে তা দেখার জন্য কিছু ল্যাবরেটরি পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে, এগুলোর মধ্যে প্রধান হল—

- জরায়ু মুখের রসের কালচার পরীক্ষা।
- যোনিরসকে অণুবীক্ষণের তলায় দেখা।

তিনটে প্রধান কারণে অস্বাভাবিক সাদা স্রাব হয়

- ব্যাকটিরিয়া দিয়ে যোনিপথের সংক্রমণ
- ট্রাইকোমোনাস (পরজীবী) ঘটিত সংক্রমণ।
- মোনিলিয়া (ছত্রাক) ঘটিত সংক্রমণ।

তিনটে কারণের চিকিৎসা আলাদা, যদিও মাঝে মাঝে একই মহিলার একাধিক ধরনের সংক্রমণ এক সঙ্গে (মিশ্র) থাকতে দেখা যায়।

ব্যাকটিরিয়া দিয়ে যোনিতে সংক্রমণ

ঠিক কী কারণে এটা ঘটে তা অনেক সময় অজানা থাকে। এই অবস্থায় যোনিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যাকটিরিয়া বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। এর ফলে যোনির ভেতরের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। একবার এই সংক্রমণ সেরে গেলেও বার বার হতে পারে। ব্যাকটিরিয়াঘটিত সংক্রমণ যোনি পথের অন্য সংক্রমণের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকতে পারে।

উপসর্গ-লক্ষণ

- স্রাবের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া।
- ছাই রঙের বা সাদা রঙের স্রাব।
- মাছ ধোয়া জলের মতো আঁশটে গন্ধ।
- যৌন মিলনের পর স্রাবের গন্ধ বেড়ে যায়।

এই সংক্রমণে আক্রান্ত মহিলাদের প্রায় শতকরা ৫০ শতাংশ কোনো উপসর্গ থাকে না।

চিকিৎসা

মেট্রোনিডাজোল বড়ি খেয়ে জীবাণুনাশ করা যায়। মেট্রোনিডাজোলে কারুর কারোর গা বমি ভাব হয় এবং প্রস্রাবের রং গাঢ় হয়। (সাদা স্রাবের ওষুধ দেখুন)। বিকল্প হল যোনিতে লাগানোর জীবাণুনাশক মলম, যা অন্তত পাঁচ দিন রোজ লাগাতে হয়।

ট্রাইকোমোনাস্ (পরজীবী) ঘটিত সংক্রমণ

ট্রাইকোমোনাস্ এক ধরনের এককোষী পরজীবী। এই সংক্রমণ প্রায় সব সময়েই যৌন মিলনের ফলে ছড়ায়। তবে শরীরের বাইরে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে এই পরজীবী ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, তাই ভেজা তোয়ালে বা ভেজা শাড়ির মাধ্যমেও এই পরজীবী একজনের থেকে অন্য জনে ছড়াতে পারে।

উপসর্গ-লক্ষণ

বেশির ভাগ পুরুষ এবং কিছু মহিলার কোনো উপসর্গ থাকে না। অন্যদের—

- হলুদ অথবা সবুজ, ফেনা ফেনা স্রাব হয়।
- স্রাবে খারাপ গন্ধ থাকে।
- স্রাবের পরিমাণ বাড়ে।
- বার বার প্রস্রাব হয়।
- যোনিমুখ (vulva) বা যোনিপথের প্রদাহ হয়।
- চুলকানি হয়।

চিকিৎসা

এ সংক্রমণের ওষুধও মেট্রোনিডাজোল। বার বার সংক্রমণ হওয়া আটকাতে যৌনসঙ্গীরও এক সঙ্গে চিকিৎসা করতে হয়।

উপসর্গ না থাকলেও তাঁর চিকিৎসা করা উচিত। চিকিৎসা শেষ না হওয়া অবধি যৌন মিলন উচিত নয়।

মোনিলিয়া (ছত্রাক) সংক্রমণ

যোনিতে স্বাভাবিক অবস্থাতেই অল্প পরিমাণে ক্যান্ডিডা অ্যাল্‌বিকানস্ নামের এক রকম ছত্রাক থাকে। ছত্রাকের পরিমাণ বেড়ে গেলে সংক্রমণ হয়েছে বলে

ধরা হয়। যোনিপথের স্বাভাবিক অম্লভাবের কমবেশি হলে সাধারণত এই সংক্রমণ হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই সংক্রমণ যৌন সংসর্গের মাধ্যমে ছড়ায় না।

কিছু অবস্থায় মোনিলিয়া (ক্যান্‌ডিডা) সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে, যেমন—

- মানসিক চাপ বৃদ্ধি।
- ডায়াবেটিস।
- গর্ভাবস্থা।
- বাচ্চা বন্ধের বড়ি ব্যবহার।
- অন্য কোনো অসুখের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ব্যবহারের ফলে যোনিপথের উপকারী ব্যাকটিরিয়া ধ্বংস হয়ে ছত্রাকের অস্বাভাবিক পরিমাণে বংশ বৃদ্ধি হওয়া।

উপসর্গ ও লক্ষণ

- স্রাবের পরিমাণ বাড়া।
- যোনিতে বা যোনিমুখে লাল ভাব, চুলকানি, জ্বালাভাব।
- সাদা, ছানার মতো স্রাব।

চিকিৎসা

এমনিতেই যোনিতে কিছুটা ছত্রাক থাকে, তাই সমস্ত ছত্রাক নষ্ট করে ফেলা অবাস্তব ব্যাপার। চিকিৎসার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছত্রাকের অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধি কমানো আর যোনিপথের অম্লত্বের মাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। ছত্রাকবিরোধী ওষুধ (যেমন ক্লোট্রিমাজোল) যোনিতে ঢোকানোর বড়ি (vaginal tablet) বা যোনিতে লাগানোর ক্রিম (vaginal cream) হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া ফ্লুকোনাজোল বা ওই ধরনের মুখে খাবার ছত্রাকনাশক বড়ি দেওয়া যেতে পারে। গর্ভবতী অবস্থায় কোনো ওষুধ ব্যবহার করতে হলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে করা উচিত। পুরুষ সঙ্গীর লিঙ্গে চুলকানি বা জ্বালা না থাকলে চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। পুরুষ সঙ্গীর চিকিৎসাতে লিঙ্গে ছত্রাকবিরোধী ওষুধ লাগাতে বলা হয়।

কিছু যৌন রোগ যাতে সাদা স্রাব হয়

ক. গনোরিয়া : গনোরিয়া ব্যাকটিরিয়াঘটিত সংক্রামক রোগ, এটা ছড়ায় যৌন মিলনের মাধ্যমে।

উপসর্গ ও লক্ষণ

- গনোরিয়া সংক্রমণ হয়েছে এমন মহিলাদের শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশি জনের কোনো উপসর্গ থাকে না।
- বাকিদের প্রধান উপসর্গ হয় স্রাব বেড়ে যাওয়া।
- এই সংক্রমণে মূত্রনালি (urethra)-র প্রদাহ হয়, প্রচুর হলদে রঙের পুঁজ বেরোতে থাকে।
- মলদ্বারেও গনোরিয়া সংক্রমণ হতে পারে। যোনির স্রাব ছড়িয়ে বা সংক্রামিত পুরুষের দ্বারা পায়ু মৈথুনে। এক্ষেত্রে প্রধান উপসর্গ হল পুঁজ বেরোনো, অনেক সময় পুঁজে রক্ত মেশানো থাকে। মলদ্বারের চারদিকে চুলকায়।
- রোগীদের কনজাংকটিভাইটিস্ (চোখ ওঠা) হতে পারে।

চি কি ৎ সা : এই রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিন, কোট্রাইমক্সাজোল, ডক্সিসাইক্লিন ইত্যাদি জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয়।

খ. ক্ল্যামাইডিয়া সংক্রমণ : এ এমন এক যৌন রোগ যা যৌনাঙ্গ থেকে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

উ প স র্গ ও ল ক্ষ ণ : প্রথমে পুরুষদের লিঙ্গে একটা ছোটো ঘা, জল বা পুঁজ ভর্তি ফুস্কুড়ি হয়। ক'দিন পর শুকিয়ে যায়। তারপর কুঁচকিতে গ্ল্যান্ড ফোলে, পুঁজ হয়, চিকিৎসা না হলে ফেটে পুঁজ বের হতে থাকে। মহিলাদের এ সংক্রমণ হলে সাদা স্রাব বাড়ে।

চি কি ৎ সা : ডক্সিসাইক্লিন বা এরিথ্রোমাইসিনের মতো কোনো একটা জীবাণুনাশক দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা হয়। প্রয়োজনে কুঁচকির ফোলা গ্ল্যান্ড থেকে সূঁচ দিয়ে পুঁজ বার করে নেওয়া হয়।

যোনিতে সংক্রমণ আটকাতে হলে কী করবেন?
(প্রতিষেধমূলক নির্দেশাবলী)

- নতুন সঙ্গীর সঙ্গে মিলনে কন্ডোম ব্যবহার করা উচিত।
- ভালোমতো খাওয়াদাওয়া করুন, পর্যাপ্ত ঘুমোন, প্রচুর তরল পান করুন।
- যোনিমুখের চারদিক পরিষ্কার ও শুকনো রাখুন।
- সুতির অন্তর্বাস পড়ুন।
- প্রস্রাব বা পায়খানা করবার পর সামনের (যোনিদ্বারের দিক) থেকে পেছনে (মলদ্বারের দিকে) মুছুন।
- দুর্গন্ধনাশক (deodorant) প্যাড বা ট্যাম্পুন (tampoon—যোনির ভেতরে লাগানোর স্পঞ্জের মতো জিনিস) ব্যবহার করবেন না।
- পিচ্ছিলকারক হিসেবে পেট্রোলিয়াম জেলি বা অন্যান্য তেল ব্যবহার করবেন না।
- যোনি ধোয়ার জন্য ডুশ ব্যবহার করবেন না।
- ডাক্তার যত দিন বলছেন তত দিন ওষুধ ব্যবহার করুন।
- চিকিৎসা পুরো না হওয়া অবধি ও উপসর্গ দূর না হওয়া অবধি যৌন মিলনে বিরত থাকুন।
- যে জায়গায় জীবাণু সংক্রমণ আছে বা প্রদাহ আছে সেখানে চুলকাবেন না, তাতে যন্ত্রণা বাড়বে।
- যোনির ভেতরে ওষুধ লাগাতে হলে তা মাসিক চলাকালীন সময়েও লাগাতে পারেন।
- জীবাণু সংক্রমণের সময় মাসিক হলে ট্যাম্পুন ব্যবহার না করে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করুন।
- সুগন্ধি বা গন্ধনাশক সাবান বা বডি ওয়াশ ব্যবহার করবেন না, যাতে যোনির বাইরে বা যোনিপথের ভেতরের আবরণীর উত্তেজনা (irritation) হতে পারে।
- পুরো চিকিৎসা হওয়ার পরেও যদি সাদা স্রাব না কমে, আবার ডাক্তার দেখান। ডাক্তারি পরীক্ষার ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে যোনিতে কোনো ওষুধ লাগাবেন না।

আরও কিছু জানার কথা : স্রাবের ওপর মাসিক চক্রের প্রভাব

মাসিক চক্র যোনিপথের পরিবেশকে প্রভাবিত করে। মাসিক চক্রের মাঝামাঝি

সময় ভেজা ভাব বাড়ে, পরিষ্কার স্রাব হয়। মাসিক চক্রের এক এক সময় যোনির অম্লত্ব কমে বাড়ে। রজোস্রাবের ঠিক আগে এবং রজোস্রাবের সময় যোনির অম্লত্ব সবচেয়ে কম থাকে। তাই এই সময় জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

যোনিতে ডুশ ব্যবহার করা কেন খারাপ?

আমাদের দেশে ডুশ খুব একটা ব্যবহার করা হয় না। ডুশে রাসায়নিক থাকে। ওই রাসায়নিক দিয়ে যোনিপথকে ধোয়া হয়। কেউ কেউ যৌন মিলনের পর গর্ভসঞ্চার হওয়া আটকাতে ডুশ ব্যবহার করেন। ডুশের রাসায়নিকে যোনির প্রদাহ হতে পারে। যোনিপথে জীবাণুর স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে। ডুশ যোনিপথের সংক্রমণকে জরায়ু ও ডিম্ববাহী নালিতে (ফ্যালোপিয়ান টিউবে) ছড়িয়ে দিতে পারে। অনেকে যোনির দুর্গন্ধ থেকে মুক্তি পেতে ডুশ ব্যবহার করেন। সাধারণত দুর্গন্ধ হয় যোনির বাইরে। সেখানটা হালকা সাবান ও জল দিয়ে ধোয়াই যথেষ্ট।

লেখক পরিচিতি : ডা. পুণ্যব্রত গুণ, এমবিবিএস, হাওড়ায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য গড়ে তোলা এক ক্লিনিকে পূর্ণ সময়ের চিকিৎসক, ও *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*-র সম্পাদক

প্রকাশিত হয়েছে

প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কর্মীদের সংগ্রহযোগ্য একটি ম্যানুয়াল

প্রাথমিক চিকিৎসা, বিষক্রিয়া ও আহতের যত্ন

পুণ্যব্রত গুণ

দাম ১০০ টাকা

পাওয়া যাচ্ছে

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ চেঙ্গাইল।

With Best compliments from

Alteus Biogenics Pvt. Ltd.

Regd. Office : 18/61B Dover Lane, Kolkata - 700 029

Phone : 033 2486-7885 / 8087

Head Office : 14-B, Dover Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 029